পড়াশোনার ক্রোড়পত্র

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৮ মার্চ ২০১৭

উত্তরণ

৮ পাতার এই রঙিন ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

স্কুলে শিক্ষার্থীদের শাস্তি কতটা গ্রহণযোগ্য?

লিখেছেন **বৃষ্টি ঘোষ**

না, না, মা– আমি আজ স্কুলে যাবই না। আজ আমার পেট ব্যথা। ক'দিন হল মা লক্ষ করছেন তাঁর ছ'বছরের ছেলে তন্ময় মোটেও স্কুলে যেতে চায় না। এটা-সেটা কোনও না কোনও অজুহাতে স্কুল না-যাওয়ার চেষ্টা করে রোজ। কোনোভাবেই তাকে স্কুলে পাঠানো যাচ্ছে না। ওর মা ওর চোখে ভয় দেখেছেন। তাই একদিন তন্ময়কে না জানিয়েই ওর বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করেন ওর মা। জানতে পারেন, স্কুলে অঙ্ক ভুল করায় চরম শাস্তি দেওয়া হয়েছে তন্ময়কে। মা বুঝতে পারেন ছেলের স্কুলে না-যেতে চাওয়ার কারণ। স্কুলে শিশুদের উপর শাস্তি– কতটুকু মঙ্গল বয়ে আনে শিশুদের জন্য, ভাবেন মা!

হ্যাঁ, শুধু তন্ময় নয়, সারা দেশে ওর মতো অনেক শিশুরই স্কুলের প্রতি অনীহার কারণ হল, শিক্ষকদের এই অমানবিক শাস্তি বা তাঁদের হিংস্র আচরণ। এই নিয়ে দেশের সরকার বিভিন্ন আইন প্রস্তুত করলেও, এগুলির যথাযথ ব্যবহার কতটা হয় তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। স্কুলে শিক্ষকদের তথাকথিত শাস্তির মধ্যে চড়, কিল, থাপ্পড়, বেত, ডাস্টার বা রুলারের আঘাত, আঙুলের ফাঁকে পেনসিল বা কলমের চাপ, নিলডাউন, কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকা, নাকে খত দেওয়া, অতিরিক্ত পড়া চাপিয়ে

দেওয়া এবং দীর্ঘক্ষণ স্কুলে আটকে রাখা– সহ নানা ধরনের নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয় স্কুলের শিক্ষার্থীদের। এতে শারীরিকভাবে যতটা না ক্ষতি হয়, তার চেয়ে বেশিমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে শিক্ষার্থীরা। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, শিশুদের ওপর শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন শুধু বেআইনিই নয়, অনৈতিকও বটে। নির্যাতিত শিশুর মনে এসব ঘটনা বেশ প্রভাব ফেলে বলে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।

রাষ্ট্রসংঘ শিশু অধিকার সনদের ৩৭ নম্বর অনুচ্ছেদে শিশুর উপর নির্যাতন বা নৃশংস, অমানবিক, মর্যাদা হানিকর আচরণ বা শাস্তি প্রদান না-করার বিষয়ে উল্লেখ করেছে। ২০০৮ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষার্থী নির্যাতন বন্ধে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দেশব্যাপী আদেশ দিয়েছেন। এই বিজ্ঞপ্তির ৩ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে, দেশের প্রচলিত নারী ও নির্যাতন দমন আইন অনুযায়ী শিশুদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং এই আইন অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী নির্যাতন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বিশ্বের সব দেশেই এই আইন কঠোরভাবে মানা হয়। মূলত শিক্ষা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী এই শব্দগুলোর সঙ্গে শাস্তি ও নির্যাতন নামক কোনও শব্দই জড়িত থাকা উচিত নয়।

এরপর সাতের পাতায়

দুইয়ের পাতায়
বিশেষ প্রবন্ধ
সুকুমার রায়
তিনের পাতায়
ক্লাস সেভেন-এর টিউশন
বিজ্ঞান
ক্লাস এইট-এর টিউশন
ইতিহাস
চারের পাতায়
ক্লাস নাইন-এর টিউশন
ইতিহাস
ক্লাস টেন-এর টিউশন
ভূগোল
পাঁচের পাতায়
স্পেশাল টিউশন
বাংলা ব্যাকরণ
কম্পিউটার
ছয়ের পাতায়
এডু টিপস ও ক্যুইজ
সাতের পাতায়
জেনারেল নলেজ
বিতর্ক যখন শিক্ষা নিয়ে
আটের পাতায়
জেনারেল নলেজ
নিষিদ্ধ দেশ তিব্বত

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

সাহিত্যের বইও পড়ো

ঋতা চন্দ প্রধান শিক্ষিকা, হরিচরণ মহামায়া গার্লস হাইস্কুল, হাইলাকান্দি

পরীক্ষায় ভালো ফল করতে হলে সর্বপ্রথম যেটা প্রয়োজন তা হল নিষ্ঠা ও একাগ্রতা। শুধুমাত্র নোটবই এবং শিক্ষকের তৈরি নোটস পড়লেই চলবে না। খুব ভালো করে পাঠ্যবই পড়ার অভ্যাস রপ্ত করতে হবে। দীর্ঘ সময় ধরে অনুশীলন করতে হবে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় নিত্যনতুন পাঠ্যক্রম ও প্রক্রিয়া তৈরি হচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজিয়ে অত্যাধুনিক ও যুগোপযোগী করে তোলা হচ্ছে। একদিকে যেমন মেধার বিকাশ ঘটছে অন্যদিকে শিক্ষার গুণগত মানও যেন অনেকটাই নেমে গেছে। বিস্তারিত না পড়ে, প্রায় কিছুই না জেনে, কিছু প্রশ্নোত্তর মুখস্থ করে প্র্যাকটিক্যাল মার্কসের সহযোগিতায় ভালো পার্সেন্টেজ পেয়ে যাচ্ছে অনেকেই। মেধাবীরাও তোতাপাখির মতো মুখস্থ করে বিদ্যায় সর্বোচ্চ নম্বর আয়ত্ত করে ফেলছে। ইঁদুরদৌড়ের প্রতিযোগিতায় দিনরাত প্রাণপাত করে যেন এক-একটি রোবট হয়ে পড়ছে মানুষ। এটা মোটেও কাম্য নয়। এই ধরনের ছাত্রছাত্রীরা কেরিয়ার সর্বস্ব হওয়ার দরুন অনেকটাই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। সামাজিক দায়বদ্ধতা, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, মানবিক মূল্যবোধের অভাব দেখা দেয় এদের মধ্যে। তাই পড়ার বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে মন ও মানসিকতার বিকাশের জন্যে মনীষীদের জীবনী এবং সাহিত্যের ভালো ভালো বইও পড়া উচিত। এতে ভাষার বাঁধুনি দৃঢ় হয়, মনন বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, সৃষ্টিশীল ক্ষমতাও জন্মায়। *এরপর সাতের পাতায়*

'উত্তরণ'-এর মুখোমুখি | রোল নং ওয়ান

প্রতিটি চ্যাপ্টারের লাইন ধরে ধরে পড়ি

বহ্নিশিখা মণ্ডল অষ্টম শ্রেণি
দক্ষিণ আখড়াতলা রবীন্দ্র শিক্ষা নিকেতন

বহ্নিশিখার জীবনের ব্রত শিক্ষা হলেও পড়ার সঙ্গে গান ও নাচ তার সময়ের অনেকটা দখল করে থাকে। সারাদিন তার যতই পড়া আর হোমওয়ার্ক থাকুক সে নিজে পড়া, গান ও নাচের সময় অবশ্যই বার করে নেয়। স্কুলের সবার কাছে সে খুব প্রিয়। মনোযোগ দিয়ে নিজের কাজ নিজে করায় সে বিশ্বাসী। তার ইচ্ছে, বড় হয়ে সে শিক্ষিকা হবে। তাই এখন থেকেই সে নিজের পড়াশোনার দায়িত্ব নিজে নিচ্ছে। তার পরিকল্পনার কথা আমরা আজ তার কাছ থেকেই শুনব।

উত্তরণ: দিনে কতক্ষণ পড়ো?

বহ্নিশিখা: সকালে স্কুলে যাওয়ার আগে ৭টা থেকে পড়াশোনা করি। বিকেলে স্কুল থেকে এসে ৫-৭.৩০ পর্যন্ত গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ি। আবার ৮-৮.৩০ থেকে নিজে পড়ি।

উত্তরণ: রাতে কতক্ষণ পড়া করো?

বহ্নিশিখা: কোনও ঠিক নেই। পড়া তৈরি না করে শুই না।

উত্তরণ: সব বিষয়েই কি তুমি গৃহশিক্ষকের সাহায্য নাও?

বহ্নিশিখা: হ্যাঁ, প্রায় সব বিষয়েই সাহায্য নিই। তবে বাংলা নিজে পড়ি।

উত্তরণ: কোন বিষয় তোমার সবথেকে প্রিয়?

বহ্নিশিখা: ইংরেজি, আমার সবথেকে বেশি প্রিয়।

উত্তরণ: পড়াশোনার জন্যে কোন বইয়ের ওপর তুমি নির্ভর করো?

বহ্নিশিখা: পাঠ্যবই খুব মন দিয়ে পড়ি। এক চ্যাপ্টার বারে বারে লাইন ধরে ধরে পড়ি। সঙ্গে রেফারেন্স বই মিলিয়ে দেখি। এছাড়া অনুশীলনের জন্যে কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক সমাধান করি। স্যাররাও প্রশ্নের তালিকা বানিয়ে দেন।

উত্তরণ: পড়াশোনায় তুমি কাদের সাহায্য পাও?

বহ্নিশিখা: মা-বাবা সারাক্ষণ পড়ার খোঁজখবর করেন। স্কুলের টিচাররা খুব সাহায্য করেন। কিছু বুঝতে না পারলে বা কোনও খাতা দেখানোর থাকলে তাঁরা সবসময় সাহায্য করেন।

উত্তরণ: বিনোদনের জন্য...

বহ্নিশিখা: টিভি দেখতে আমার ভালো লাগে। সময় পেলে টিভি দেখি। খেলতেও ভালো লাগে। কিন্তু খুব একটা সুযোগ হয় না।

উত্তরণ: তোমার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগল। আমরা তোমার সবরকমের সাফল্য কামনা করি

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৮ মার্চ ২০১৭

সুকুমার রায়ের শিক্ষাজীবন

সুকুমার রায় কলকাতার সিটি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন। ১৯০৬ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি এস সি পাস করেন। এরপর মুদ্রণ বিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষার জন্য তিনি বিলেতে যান ১৯১১ সালে। সেখানে তিনি আলোকচিত্র ও মুদ্রণ বিষয়ে পড়াশোনা করেন। কালক্রমে তিনি ভারতের অগ্রগামী আলোকচিত্রী ও লিথোগ্রাফার হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯১৩ সালে তিনি কলকাতা ফিরে আসেন।

সুকুমার রায়

আয় যেখানে খ্যাপার গানে
নাইকো মানে নাইকো সুর।
আয়রে যেথায় উধাও হাওয়ায়
মন ভেসে যায় কোন্ সুদূর।

সুকুমার রায় বলতে আমরা এই বুঝি। মন খুলে আবোল তাবোল বলার স্বাধীনতা। তিনি যদিও বলতে পারেন ‘নাইকো মানে’। তবে তা ঠিক নয়। তার মানেও আছে আবার দরকারও আছে। তাই তো তিনি ছোট-বড় সবার এত প্রিয়। তাঁর ‘আবোল তাবোল’ ছাড়া আমাদের চলেই না। বাংলাসাহিত্যে কঠিন কঠিন সব কথা যাদের কিছু বিজ্ঞান, কিছু দর্শন, কিছু মানব চরিত্র, কিছু ভূগোল, কিছু ইতিহাস– এরকম মজার ছলে লিখতে খুব কম জনই পেরেছেন। আবোল তাবোল নামটাই তো কী অদ্ভুত! মানে যার কোনও মাথামুন্ডু নেই। শুনলে মনে হয়, যা মনে এসেছে লেখক তাই লিখেছেন ভাবনাচিন্তার লেশমাত্র নেই। শুধু তাই না সেই আবোল তাবোলের কত বিষয়। যেমন ধরো ‘গোঁফ চুরি’। গোঁফ কখনও চুরি যায় না নিজেই ছড়াটার মধ্যে স্বীকার করেছেন অথচ সেই গোঁফই কিনা গেছে চুরি। কত মজা লাগে পড়তে ছড়াটা। আবার ধরো, ‘প্যাঁচা কয় প্যাঁচানি খাসা তোর চেঁচানি’ লাইনটা পড়ার সময় আমাদের মনে প্যাঁচার তার প্যাঁচানির প্রতি যে একরাশ আদর তা চট করে কেমন মনে ভেসে ওঠে। তাঁরা পক্ষকুলে খুব সুন্দর বা উঁচুদরের কেউ নয়। তবুও তাদের প্রেম কেমন জমিয়ে কিন্তু মজা করে লিখলেন সুকুমার রায়। এখানেই তো সুকুমার রায়ের পরিচয়, এভাবেই তার আবোল তাবোল নামের সীমানা ছাড়িয়ে সেই কোন কাল থেকে একইভাবে সবার ঘরে ঘরে জায়গা করে নিয়েছে, আজও একটুও পুরনো হয়নি। শুধু ছড়াই বা বলছি কেন তার গল্প, নাটক সবকিছুই একইভাবে মর্যাদা পেয়েছে কচিকাঁচা ও বড়দের কাছেও। সেই সুকুমার রায়ের কিছু কথা আজ আমরা জানব।

সুকুমার রায়ের জন্ম কবে?

সুকুমার রায়ের জন্ম হয় ১৮৮৭ সালের ৩০ অক্টোবর।

সুকুমার রায়ের পারিবারিক পরিচয় দাও।

সুকুমার রায় বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ছেলে। তাঁর মা বিধুমুখী দেবী ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মেয়ে। সুকুমার রায়ের সন্তান হলেন বিখ্যত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়।

সুকুমার রায় কতদিন বেঁচেছিলেন?

তিনি মাত্র ৩৭ বছর বাঁচেন। ১০ সেপ্টেম্বর ১৯২৩-এ তাঁর মৃত্যু হয়।

সুকুমার রায়ের কীভাবে মৃত্যু হয়?

কালাজ্বরে ভুগে সুকুমার রায় মারা যান। তখনও সেই রোগের চিকিৎসা ছিল না।

সুকুমার রায়ের ডাকনাম কী?

তাতা।

কীভাবে এই নাম আসে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসের দুই চরিত্র ‘হাসি’ আর ‘তাতা’। সেই থেকে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি ছেলেমেয়ের নাম রাখেন হাসি আর তাতা। তাই সুকুমার রায়ের নাম হয়েছিল তাতা।

সুকুমার রায়ের অন্যান্য ভাই-বোনের নাম কী?

সুখলতা, পুণ্যলতা, শান্তিলতা, সুবিনয় ও সুবিমল রায়।

সুকুমার রায় কোন ধরনের লেখক ছিলেন?

সুকুমার রায় একাধারে শিশুসাহিত্যিক, রম্যরচনাকার, গল্পকার, প্রাবন্ধিক ও নাট্যকার।

সুকুমার রায় কোন ধরনের রচনার প্রবর্তক?

সুকুমার রায় ‘ননসেন্স রাইম’-এর প্রবর্তক।

সুকুমার রায় কোন সময়ে জন্মেছিলেন?

সুকুমার রায় বাঙালি নবজাগরণের স্বর্ণযুগে জন্মেছিলেন।

সুকুমার রায় উপেন্দ্রকিশোরের কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?

উপেন্দ্রকিশোর একসময় ছাপার ব্লক তৈরির কৌশল নিয়ে গবেষণা করেন। এটি নিয়ে তিনি এক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, নাম দেন ‘মেসার্স ইউ রয় এন্ড সন্স’। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সুকুমার রায় যুক্ত ছিলেন।

সুকুমার রায়ের সাহিত্য প্রতিভা কার কার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল?

উপেন্দ্রকিশোর রায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। সুকুমার রায়ের উপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গভীর প্রভাব ছিল। সুকুমার রায়ের পিতা ছিলেন সেই সময়কার নামকরা লেখক। এছাড়া আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের যথেষ্ট আত্মীয়তা ছিল এই রায় পরিবারের সঙ্গে।

সুকুমার রায় সন্দেশ পত্রিকার সঙ্গে কীভাবে যুক্ত হন?

সুকুমার রায় ইংল্যান্ডে পড়াকালীন উপেন্দ্রকিশোর একটা জমি কিনে সেখানে উন্নত মানের রঙিন হাফটোন ব্লক তৈরি ও মুদ্রণক্ষম একটা ছাপাখানা তৈরি করেন। এই সময় তিনি ‘সন্দেশ’ নামে একটি মাসিক পত্রিকা ছোটদের জন্য প্রকাশ করেন। সুকুমার রায়ের লেখা শুরু মূলত ‘সন্দেশ’ পত্রিকার হাত ধরেই। উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর সুকুমার রায় এই ‘সন্দেশ’ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। শুরু হয় শিশুসাহিত্যের এক নতুন অধ্যায়। তাঁর পরিবারের অনেক সদস্য এই সন্দেশে লেখা পাঠিয়ে তাদের সাহায্য করেছিলেন।

তিনি কোন কোন ক্লাবের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

সুকুমার রায় প্রসিডেন্সিতে পড়াকালীন ‘ননসেন্স ক্লাব’ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পরে ‘মন্ডা (Monday) ক্লাব’ নামে একই ধরনের আরেকটি ক্লাব গঠন করেন।

ননসেন্স ক্লাবের মুখপাত্র কী ছিল?

সুকুমার রায়ের প্রতিষ্ঠিত ননসেন্স ক্লাবের মুখপাত্র ছিল ‘সাড়ে বত্রিশ ভাজা’ নামে এক পত্রিকা। এখানেই তার আবোল তাবোল ছড়ার চর্চা শুরু হয়।

সুকুমার রায় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত ছিলেন?

সুকুমার রায় ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারপন্থী গোষ্ঠীর এক তরুণ নেতা। সুকুমার রায় ‘অতীতের কথা’ নামে এক কাব্য রচনা করেছিলেন যা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসকে সরল ভাষায় ব্যক্ত করে। ছোটদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের মতাদর্শের উপস্থাপনার জন্য এই কাব্যটি একটি বইয়ের আকারে প্রকাশ করা হয়।

সুকুমার রায় রচিত গ্রন্থাবলির নাম লেখো।

সুকুমার রায়ের রচিত গ্রন্থাবলি হল আবোল তাবোল, পাগলা দাশু, হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি, খাই খাই, অবাক জলপান, লক্ষণের শক্তিশেল, ঝালাপালা ও অন্যান্য নাটক, হজবরল, শব্দকল্পদ্রুম, ভাষার অত্যাচার।

সুকুমার রায়ের তৈরি কিছু কাল্পনিক চরিত্রের নাম লেখো।

দ্রিঘাঙচু, হাঁসজারু, কাঠবুড়ো, ট্যাঁশ গরু, কাতুকুতু বুড়ো, কিম্ভূত, হুঁকোমুখো হ্যাংলা, কুমড়ো পটাশ ইত্যাদি।

স্কুলের সেরা সরস্বতী পুজোর ফলাফল

- **প্রথম স্থানাধিকারী স্কুল: কামাক্ষ্যা বিদ্যালয়, গুয়াহাটি**
- **দ্বিতীয় স্থানাধিকারী স্কুল: আধারচাঁদ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, শিলচর**
- **তৃতীয় স্থানাধিকারী স্কুল: মহর্ষি সন্দীপন বিদ্যাপীঠ, বদরপুর**

স্কুল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হচ্ছে ‘স্কুলের সেরা সরস্বতী পুজোর ট্রফি’টি যুগশঙ্খ অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন: **বিদিশা রায়চৌধুরী** (9864892994)

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৮ মার্চ ২০১৭

ক্লাস সেভেন-এর টিউশন | বিজ্ঞান

আলো

আজ আমাদের আলোচনার বিষয় আলো। প্রাত্যহিক জীবনে আলোসংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা ও আলোর সরলরৈখিক গতি, এই সবকিছু নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

জানালা থেকে একটু দূরে উজ্জ্বল রোদে তুমি পড়তে বসেছ। এমন সময় তোমার মা জানালার পাশে এসে দাঁড়ালেন। ব্যস, উজ্জ্বল রোদের বদলে একটা ছায়া এসে হাজির। এখন সব আবছা আবছা হয়ে গেল।

রাহুল দুপুরবেলা বটগাছের তলায় বসেছিল। তন্ময় হয়ে দেখছিল জলের ঢেউয়ের খেলা। কিন্তু হঠাৎ চোখ যেন আলোয় ধাঁধিয়ে গেল। তখন ঢেউগুলোকে চকচকে লাগছিল।

আনোয়ারা খালি বালতি যখন জল দিয়ে ভর্তি করল তখন হঠাৎই বালতিটার উপর থেকে দেখে ও অবাক হয়ে গেল। বালতির গভীরতা যেন কমে যাচ্ছে মনে হচ্ছে।

এরকম কত ঘটনাই দেখি আমাদের চারপাশে। এসবই আলোর খেলা। আলোর সম্বন্ধে জানলে এসব ঘটনা কেন ঘটে তা বোঝা যায়। আমরা এখন সেটাই করব। জানব আলোর নানা কথা।

আলোর উৎস যদি আকারে খুব ছোট হয়, আমরা অনেক সময় তাকে বিন্দু উৎস বলি। একটি টর্চের আলোর সামনে কালো কার্ডবোর্ড রেখে ওই বোর্ডের গায়ে পিন দিয়ে একটি ছিদ্র করা হল। ওই ছিদ্র দিয়ে যখন টর্চের আলো বেরিয়ে আসছে তখন ছিদ্রটিকে বিন্দু আলোক উৎস বলে ভাবা যেতে পারে। তবে একথা ভুললে চলবে না যে, জ্যামিতিতে আমরা বিন্দু বলতে যা বুঝি সেরকম অনেক বিন্দু মিলেই আসলে এইসব বিন্দু উৎসগুলি তৈরি। খুঁটিয়ে বিচার করলে ওই কার্ডবোর্ডের ছিদ্র বা শুদ্ধ অর্থে বিন্দু উৎস নয়।

স্বপ্রভ বস্তু নিজে যেমন আলোর উৎস, তেমনি অপ্রভ বস্তুও আলোর উৎস হিসাবে আচরণ করতে পারে। কোনও স্বপ্রভ বস্তু থেকে আলো অপ্রভ বস্তুতে পড়লে ঠিকরে বেরোয়। যেমন স্টিলের বাসন একটি অপ্রভ বস্তু, কিন্তু তাতে সূর্যের আলো পড়ে সেই আলো ঠিকরে দেওয়ালে যখন পড়ে তখন স্টিলের বাসনটিই আলোর উৎসের মতো আচরণ করে।

বিন্দু আলোক উৎসের চেয়ে আকারে বড় আলোক উৎসকে বিস্তৃত আলোক উৎস বলে। যেমন, টর্চ, সূর্য, বৈদ্যুতিক বালব।

কাচের জানলা বন্ধ করে রাখলেও বাইরের রোদ তা দিয়ে ঘরে ঢোকে। কিন্তু কাঠের জানালায় তো তা হয় না। আলো সবরকম পদার্থের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে না। ভেবে দেখো তো আলো জলের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে? বায়ু, স্বচ্ছ কাচ, জল ইত্যাদি বস্তুগুলোকে স্বচ্ছ বস্তু বা স্বচ্ছ মাধ্যম বলে। এ-ধরনের বস্তু দিয়ে আলো সহজেই যাতায়াত করতে পারে। আবার কাঠ, দেওয়াল, লোহা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে আলো একেবারেই যেতে পারে না। এদের অস্বচ্ছ বস্তু বলে। ঘষা কাচ, কুয়াশা, ট্রেসিং পেপার ইত্যাদি বস্তুর মাধ্যমে আলো যাতায়াত করতে পারলেও, ভালোভাবে পারে না, এই বস্তুকে ঈষদ স্বচ্ছ বস্তু বলে।

আলোর সরলরৈখিক গতি—

একটা শক্ত ও দু'দিক খোলা পাইপ নাও। এবার এক চোখ বন্ধ করে পাইপটির মধ্যে দিয়ে একটি জ্বলন্ত মোমবাতির শিখাকে দেখার চেষ্টা করো। এবার একটা বাঁকা পাইপ নাও। এবার পাইপটির মধ্য দিয়ে আগের মতো করেই দেখার চেষ্টা করো। বাঁকানো পাইপের মধ্য দিয়ে মোমবাতির শিখাটি আর দেখতে পাচ্ছ কি? কেন এমন হল ভাবো তো।

কোনও বস্তুকে দেখতে হলে ওই বস্তু থেকে আলো এসে আমাদের চোখে এসে পড়ে, তবেই ওই বস্তুকে দেখা সম্ভব।

প্রথম ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে। তাহলে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কী মোমবাতির শিখা থেকে আসা আলো তোমার চোখ অবধি পৌঁছতে পারেনি?

কেন পারল না? আলো কী আসার পথে কোনও বাধা পেয়েছে? কেনই বা বাধা পেল? প্রথম ও দ্বিতীয় আলোর যাত্রাপথের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

পাইপটা সোজা থাকায় আলো প্রথম ক্ষেত্রে শিখা থেকে চোখে পৌঁছতে পেরেছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পাইপটি ছিল বাঁকা। তাই আলো চোখে এসে পৌঁছতে পারেনি। তাহলে বলা যায়, আলো সরলরেখায় চলাচল করে। এটা আলোর একটি ধর্ম।

ক্লাস এইট-এর টিউশন | ইতিহাস

আঞ্চলিক শক্তির উত্থান

১৭০৭ সালে মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়। অন্যদিকে ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উত্থান ঘটে। এই দুই ঘটনার ৫০ বছরের মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস অনেকটাই বদলে গিয়েছিল। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। তাঁর উত্তরসূরিদের পক্ষে সাম্রাজ্য ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে মুঘলদের এই অবনতিকে বিভিন্ন সম্রাটের ব্যক্তিগত দক্ষতা-ব্যর্থতা দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। যদিও ঐতিহাসিকদের একাংশ এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত নন। তাঁরা বিভিন্ন দিক থেকে এই পতনকে বিশ্লেষণ করেছিলেন।

বিশ্লেষকদের মতে, সম্রাট জাহাঙ্গির ও শাহ জাহানের সময় থেকেই মুঘল শাসন কাঠামোয় নানা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে বিশেষত শেষদিকে মুঘল সাম্রাজ্যের কাঠামোগত দুর্বলতাগুলো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ঔরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীরা সেই দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। বরং তাঁদের নানা অযোগ্যতার ফলে সেই দুর্বলতাগুলো আরও বেশি মাথাচাড়া দিয়েছিল।

মুঘলদের সামরিক ব্যবস্থার অবনতি তেমনই একটি দুর্বলতা ছিল। অষ্টাদশ শতকের মুঘল সম্রাটরা কোনও সামরিক সংস্কার করেননি। ফলে সাম্রাজ্যের ভিতরের বিদ্রোহ হোক আর বাইরের আক্রমণ, দুর্বল সামরিক ব্যবস্থা সে-সবের মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়। শিবাজি ও মরাঠাদের আক্রমণ মুঘল শাসনকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। অন্যদিকে পারসিক আক্রমণ

ও আফগান আক্রমণে দিল্লি শহর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

পাশাপাশি, জায়গিরদারি ও মনসবদারি ব্যবস্থার সংকট মুঘল শাসন কাঠামোকে বিপর্যস্ত করে। বিশেষত, ভূমি রাজস্বের হিসাব নিয়ে গরমিল দেখা দেয়। এর প্রভাব পড়ে অর্থনীতির ওপর। জায়গির নিয়ে অভিজাতদের দলাদলি সাম্রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে উঠেছিল।

সাম্রাজ্যের আয়ব্যয়ের গরমিল বাস্তবে কৃষিব্যবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। এই চাপের বিরুদ্ধে একাধিক কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এসবের ফলে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মুঘল সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

মুঘল শাসনের দুর্বলতার ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক শক্তি মাথাচাড়া দিয়েছিল। এই সমস্ত আঞ্চলিক শাসকরা সরাসরি মুঘল কর্তৃত্ব অস্বীকার করেননি। মৌখিকভাবে মুঘল কর্তৃত্বের বৈধতাকে সকল আঞ্চলিক শক্তি মেনে চলত। এমনকী অনেক আঞ্চলিক রাজ্যই নিজেদের প্রশাসনকে মুঘল প্রশাসনের ছাঁচেই গড়ে তুলেছিলেন। তাই মুঘল শাসনব্যবস্থা দুর্বল হলেও মুঘল রাষ্ট্র কাঠামো ভেঙে পড়েনি। বরং আঞ্চলিক শক্তিগুলির মধ্যে দিয়ে তা টিকে ছিল।

মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার ওপর ভিত্তি করে বাংলায় আঞ্চলিক শাসকের উদ্ভব ঘটেছিল। সুবা বাংলার রাজস্ব আদায়ের জন্য মুর্শিদকুলি খানকে বাংলার দেওয়ান হিসাবে পাঠিয়েছিলেন সম্রাট ঔরঙ্গজেব। সম্রাট বাহাদুর শাহের আমলেও মুর্শিদকুলি ওই পদে বহাল ছিলেন। দেওয়ান পদে তাঁর নিয়োগে পাকাপাকি শিলমোহর দেন সম্রাট ফারুখশিয়র। ১৭১৭ সালে মুর্শিদকুলিকে বাংলার নিজামি পদ দেওয়া হয়। ফলে দেওয়ান ও নাজিমের যৌথ দায়িত্ব পাওয়ার জন্য সুবা বাংলায় মুর্শিদকুলির ক্ষমতা চূড়ান্ত হয়ে পড়ে। আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে বাংলায় উত্থান ঘটে মুর্শিদকুলি খানের। ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলির মৃত্যুর সময়ও তাঁর সঙ্গে মুঘলদের সম্পর্ক ভালো ছিল। মুর্শিদকুলির উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে গোলযোগ বাধে। সেই পরিস্থিতিতে জগৎ শেঠ ও কয়েকজন ক্ষমতাবান জমিদারের মদতে সেনাপতি আলিবর্দি খান সুবা বাংলার ক্ষমতা দখল করেন।

বাস্তবে আলিবর্দি খানের সময় থেকেই মুঘলদের হাত থেকে সুবা বাংলার অধিকার বেরিয়ে যায়। শাসনতান্ত্রিক কোনও তথ্য দিল্লির মুঘল দরবারে জানানো হত না। তাছাড়া রাজস্ব পাঠানোর ব্যবস্থাও বন্ধ হয়ে যায়। মুঘল কর্তৃত্ব আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকার করা হলেও বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় আলিবর্দি কার্যত একটি স্বশাসিত প্রশাসন চালাতেন। ১৭৫৬ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে দৌহিত্র সিরাজ-উদ-দৌলা নতুন নবাব হন। কিন্তু দ্রুতই দরবারের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ব্রিটিশ কোম্পানির সঙ্গে সিরাজের সংঘাত বাধে। তার পরিণতিতে বাংলার শাসনব্যবস্থায় ব্রিটিশ কোম্পানির কর্তৃত্ব তৈরি হয়েছিল।

মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে দক্ষিণ ভারতের হায়দরাবাদে আঞ্চলিক শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। মুঘল দরবারের অন্যতম শক্তিশালী অভিজাত মির কামারউদ্দিন খান সিদ্দিকি ১৭২৪ সালে হায়দরাবাদ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। মুঘল প্রাদেশিক শাসক মুবারিজ খান হায়দরাবাদে প্রায় স্বাধীন শাসকের মতো ছিলেন। ১৭২৩ সালে মুবারিজ খানকে হারিয়ে দেন আসফ খাঁ ও পরের বছর দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হয়ে হায়দরাবাদ অঞ্চলে নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

এদিকে, ১৭২২ সালে সাদাত খানের নেতৃত্বে অযোধ্যা একটি স্বশাসিত আঞ্চলিক শক্তি হিসাবে গড়ে ওঠে। মুঘল প্রশাসক হিসাবে সাদাত খানের দায়িত্ব ছিল অযোধ্যার স্থানীয় রাজা ও গোষ্ঠীর নেতাদের বিদ্রোহ দমন করা। দ্রুত সে কাজে সফল হওয়ার জন্য মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহের থেকে 'বুরহান-উল মুলুক' উপাধি পান। সেই সুবাদে নিজের জামাই সফদর জং-কে অযোধ্যার প্রশাসক হিসাবে নিযুক্ত করান সাদাত খান। তাঁর পরিকল্পনাতেই মুঘল প্রভাবমুক্ত প্রশাসন গড়ে উঠেছিল।

দীপ দাশগুপ্ত
ক্রিকেটার

দেশের বাইরে টুর্নামেন্ট খেলতে গেলে সবসময় যে সুযোগ পাওয়া যায় সেটা নয়। তখন ফোকাসটা শুধু খেলার দিকেই থাকে। তবে চেষ্টা করি তার মধ্যেও সময় বের করে আশপাশটা একটু ঘুরে নেওয়ার। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলতে গিয়ে টেবল টপ মাউন্টেন্টে গেছিলাম। সুন্দর জায়গা। ২০০৩-এ টুর্নামেন্ট খেলতে অস্ট্রেলিয়া গেছিলাম। ওরা ৩১ ডিসেম্বর সিডনিতে পালন করে। ওই সময় ওখানে খুব এনজয় করেছিলাম।

রণদীপ বসু
ক্রিকেটার

আমার স্কুল জীবনটা খুবই সাধারণ ভাবে কেটেছে। আমি সেন্ট লরেন্স হাইস্কুলে পড়তাম। পড়াশোনার সঙ্গে এক্সট্রা ক্যারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিতে ক্রিকেটটা রেখেছিলাম। তবে খেলার জন্য পড়াশোনায় ফাঁকি দেওয়া, এই ব্যাপারটা কখনও হয়নি। গ্র্যাজুয়েশনের পরই খেলাটাকে আমি কেরিয়ার হিসেবে নিই।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৮ মার্চ ২০১৭

সন্দীপ নন্দী
ফুটবলার

স্কুলে যখন পড়তাম তখন পড়াশোনার থেকে খেলার দিকে মনটা বেশি থাকত। স্কুলে গিয়ে অপেক্ষায় থাকতাম কখন টিফিন হবে। টিফিন টাইমে খাওয়া ভুলে খেলায় মেতে থাকতাম। তবে পড়াশোনাটাকে কখনও অবহেলা করিনি। আমি বর্ধমান রেলওয়ে বিদ্যাপীঠে পড়তাম। কলেজ লাইফে পাকাপাকি ভাবে খেলা শুরু করি।

রাকেশ মাসি
ফুটবলার

আমি পঞ্জাবের গোধরপুর গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে পড়তাম। সেখানে ফুটবল শেখানো হতো। ফুটবল খেলতে আমার ভালো লাগত। পড়াশোনার ফাঁকে সুযোগ পেলেই খেলতাম। আমার স্কুলের গেম টিচারদের থেকে অনেক কিছু শিখেছি। তাঁরা আমার মনের জোর, আত্মবিশ্বাস বাড়াতে অনেক সাহায্য করেছেন। স্কুল লাইফটা খুব মিস করি।

ক্লাস নাইন-এর টিউশন | ইতিহাস

নবজাগরণ ও মানবতাবাদ

আজ আমরা আলোচনা করব ‘নবজাগরণ ও মানবতাবাদ’ নিয়ে। ইউরোপে রেনেসাঁসের যুগে মানবতাবাদ ছিল একটি আন্দোলনের নাম। ইতালিতে মানবতাবাদ বৌদ্ধিক আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নৈতিকতার মন্ত্রটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নীতিবোধের ভিত্তি গড়ে উঠেছিল মানবতার উপর। রেনেসাঁসের যুগে ইউরোপে ‘হিউম্যানিজম’ বা মানবতাবাদ বলতে মানববিষয়ক বিদ্যার চর্চাকে বোঝাত। সেইসঙ্গে প্রাচীন গ্রিক ও রোমান ধ্রুপদী সভ্যতার বিদ্যা ও জ্ঞানের চর্চা ‘হিউম্যানিজম’-এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। চতুর্দশ শতকে লাতিন সাহিত্যের সঙ্গে ধ্রুপদী গ্রিক সাহিত্যের পাঠ শুরু হয়। বিভিন্ন বিষয়ে বই লেখা হতে থাকে। ইতিহাস, ভূগোল, নীতিশাস্ত্র, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি নানা বিষয়ে জানার ইচ্ছা জাগতে থাকে মানুষের মধ্যে। এই নতুন পাঠ্যসূচির নাম দেওয়া হয় ‘স্টাডিজ হিউম্যানিটিস’। এখান থেকে ‘হিউম্যানিটিস’ শব্দটি আসে। ‘হিউম্যানিটিস’-কে সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত পাঠ্যসূচিকে বোঝানো হয়ে থাকে।

রেনেসাঁস সামাজিক আদর্শপ্রসূত ছিল কি না তা বলতে গেলে বলা যায়, রেনেসাঁসপ্রসূত মানবতাবাদ ছিল একটি বৌদ্ধিক আন্দোলন। পঞ্চদশ শতকে এই আন্দোলন প্রথমে প্রভাবিত করে সমাজের বুদ্ধিজীবী শ্রেণিকে। বুদ্ধিজীবী অংশ সমাজের ভিতর থেকেই নতুন ধরনের পড়াশোনার চর্চার কথা বলতে থাকে। এই নতুন ধরনের চর্চাই ছিল ‘স্টাডিজ হিউম্যানিটিস’ অর্থাৎ মানবকেন্দ্রিক শিক্ষা। মানবতাবাদের ছ’টি বিষয় লক্ষণীয়— ১) নীতিবোধ, ২) বুদ্ধিবিভাষা, ৩) ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ, ৪) ধর্মনিরপেক্ষতা, ৫) প্রকৃতিপ্রেম এবং ৬) প্রাচীন গ্রন্থ পাঠের প্রতি আকর্ষণ।

ইউরোপে প্রথম মানবতাবাদের উন্মেষ ঘটে ইতালিতে। মূলত, ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে ‘স্টাডিজ ডিউম্যানিটিস’-এর

চর্চার সূত্রপাত হয়। ফ্লোরেন্স থেকে বহু মানুষ ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করতেন। এই চলাচলের পথেই ইউরোপে মানবতাবাদ প্রবেশ করে। ইউরোপে মানবতাবাদের দু’টি ধারা ছিল— ১) ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ ও ২) খ্রিস্টীয় মানবতাবাদ। সাহিত্যের ওপর প্রথম ধারণার সবথেকে বেশি প্রভাব পড়ে। গড়ে ওঠে মানবতাবাদী সংস্কৃতি। এই মানবতাবাদী সংস্কৃতি ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। যার নির্যাস ছিল সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথা।

সিস্টেলারের মতে, তিনটি ধারার মধ্যে হিউম্যানিজম আবর্তিত হয়। প্রথমত, মধ্যযুগের অলংকার শাস্ত্রের সঙ্গে লাতিন সাহিত্য পাঠ। দ্বিতীয়ত, বিষয়গুলিকে ভালোভাবে চর্চা করা ও লালন করা এবং তৃতীয়ত, নব্য-প্লেটোনিয় দর্শনের মধ্য দিয়ে মানবতাবাদ অগ্রসর হতে থাকে। অন্যদিকে এই বিষয়টি সিমন্ডস ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, উদারবাদী উত্থান হতে থাকে চারটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। যথা— ১) প্রাচীন ধারার পুনরায় আবিষ্কার, ২) অনুবাদ ও বিষয়ীভূতকরণ, ৩) জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের বিস্ফোরণ এবং ৪) ব্যক্তিকেন্দ্রিক আন্দোলনের অবক্ষয়। সিমন্ডসে আরও জানিয়েছেন, চতুর্থ পর্যায় অর্থাৎ ব্যক্তিকেন্দ্রিক আন্দোলনের অবক্ষয়ের বিষয়টি একেবারে নতুন চিন্তাভাবনা ছিল। মূলত, মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পরে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ছেড়ে রেনেসাঁস প্রসারিত হয় পুস্তকের মাধ্যমে। এটাও ঠিক যে, মানবতাবাদ শিখিয়েছিল প্রাচীন ধ্রুপদী বিদ্যার মধ্যে রয়েছে জ্ঞান। এই ধারণা রেনেসাঁসের ধারণা ছিল। ঈশ্বর এঁদের কাছে ছিল একটি ধারণামাত্র। যেমন কুজেনস বলেছিলেন, ‘ঈশ্বর এই বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু আবার পরিধিও, কিন্তু মানুষের শক্তিও অসীম।’

মানবতাবাদ ছিল রেনেসাঁসের একটি বিশেষ অবদান। রেনেসাঁর সঙ্গে মানবতাবাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ধারাটি হল— চিঠিপত্র লেখা এবং সাহিত্যপাঠ। বিশেষত, এই সময়ে ধ্রুপদী সাহিত্য পাঠের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ধারায় ছিল ধ্রুপদী সাহিত্যের সঙ্গে ব্যাকরণ, অলংকার শাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও ইতিহাস পাঠ। এই ধারাটির সূচনা হয়েছিল চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে। তৃতীয় ধারাটি ছিল নিও-প্লেটোনিক চিন্তাধারার অভ্যুদয়। এই ধারাটি বিবর্তিত হয়েছিল নগররাষ্ট্রগুলিতে। নবজাগরণের চিন্তার বিপুল প্রবাহে এসে যোগ দিয়েছিলেন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ। এর মধ্যে ছিলেন মেদিচির মতো ব্যাঙ্কার, মেকিয়াভেলির মতো নগররাষ্ট্রের সচিব, পেত্রার্কের মতো স্বাধীন লেখক। এছাড়াও এই প্রভাবে যোগ দিয়েছিল চিকিৎসক, পোপ, যাজক, সামন্ত, সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শাসক শ্রেণি পর্যন্ত। এর ফলে প্লেটোর চিন্তা ও গ্রিক ও রোমান ভাবনার যোগ থেকেছে। এর হাত ধরে জন্ম নিয়েছে নতুন চিন্তা।

ক্লাস টেন-এর টিউশন | ভূগোল

বহির্জাত প্রক্রিয়া দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ

আজ আমরা আলোচনা করব ভূমিরূপ গঠনে পার্থিব প্রক্রিয়ার অন্তর্গত প্রক্রিয়া নিয়ে। এই দু’টি প্রক্রিয়া হল— অন্তর্জাত প্রক্রিয়া ও ভগ্ন বহির্জাত প্রক্রিয়া। এবার আমরা আলোচনা করব ভূমিরূপ গঠনে বহির্জাত প্রক্রিয়ার ভূমিকা নিয়ে।

আবহবিকার-এর ভূমিকা: আবহবিকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিরূপ গঠনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যেমন, যান্ত্রিক আবহবিকার ফলে মরু অঞ্চলে গোলাকৃতির ভূমিরূপ ও টর ভূমিরূপ, পর্বতের পাদদেশে ট্যালাস ভূমিরূপ এবং রাসায়নিক আবহবিকার ফলে চুনাপাথর গঠিত অঞ্চলে কার্স্ট ভূমিরূপ গঠিত হয়।

পুঞ্জিত ক্ষয়-এর ভূমিকা: পুঞ্জিত ক্ষয়ের ফলে পর্বতের ঢালে দীর্ঘ ও সংকীর্ণ খাত, পর্বতের পাদদেশে স্তূপাকার উচ্চভূমি, পলিশঙ্কু, শৈলশিরা, ধাপ প্রভৃতি ছোট ছোট ভূমিরূপ গঠিত হয়।

নদীর ভূমিকা: উচ্চ বা পার্বত্য প্রবাহে নদীর ক্ষয়কার্য এবং মধ্য ও নিম্ন প্রবাহে বহন ও সঞ্চয়কার্যের ফলে গিরিখাত, ক্যানিয়ন, জলপ্রপাত, স্বাভাবিক বাঁধ, প্লাবনভূমি, ব-দ্বীপ প্রভৃতি ভূমিরূপ গঠিত হয়।

হিমবাহের ভূমিকা: নদীর মতো উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে হিমবাহের ক্ষয়কার্য ও বহন এবং পর্বতের পাদদেশে সঞ্চয়কার্যের ফলে এরিটি, পিরামিড চূড়া, রসে মোতানে, ক্র্যাগ ও টেল, ড্রামলিন, এস্কার, কেম, বহিঃধৌত সমভূমি প্রভৃতি ভূমিরূপ গঠিত হয়।

বায়ুপ্রবাহের ভূমিকা: মরুভূমি অঞ্চলে বায়ুর

ক্ষয়কার্য ও সঞ্চয়কার্যের ফলে ভেন্টিফ্যাক্ট, ড্রেইকান্টার, গৌর, জিউগেন, ইয়ার্দাং, ইনসেলবার্জ, বালিয়াড়ি, লোয়েস সমভূমি প্রভৃতি ভূমিরূপ গঠিত হয়।

সামগ্রিকভাবে বহির্জাত প্রক্রিয়ার দ্বারা ক্ষয়চক্রের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে অবরোহণ ও আরোহণ প্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠের প্রাথমিক ভূমিরূপ, যেমন— পর্বত, মালভূমি, প্রভৃতির উচ্চতা হ্রাস ও ক্ষয়জাত পদার্থ দ্বারা ভূপৃষ্ঠে নতুন নতুন ভূমিরূপ গঠিত হয়।

এবার আমরা আলোচনা করব নদীর বিভিন্ন অংশের কাজ দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ নিয়ে।

জলচক্র: জলচক্র বলতে বোঝায় প্রাকৃতিক প্রভাবে ক্রমাগত রূপান্তরের মাধ্যমে জলের পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসাকে। জলচক্রের অর্থ হল জলের চক্রাকারে ক্রমাগত সঞ্চারণশীলতা। এই চক্রকে হাইড্রলজিক্যাল চক্রও বলা হয়ে থাকে। এই জলচক্রের জন্যই এই পৃথিবীতে জলের সামঞ্জস্য ব্যাহত হয় না।

নদী: সাধারণত উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল বা মালভূমি থেকে বৃষ্টির জল, বরফগলা জল বা ঝরনাধারা থেকে জল হাজার হাজার ফুট উঁচু এলাকা থেকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে তীব্র বেগে নীচের দিকে ধেয়ে আসে এবং শেষে কোনও বিশাল জলাশয়, হ্রদ বা সমুদ্রে পড়ে। তখন সেই দ্রুত গতিসম্পন্ন জলস্রোতকে নদী বলে।

নদী অববাহিকা: যে ভূমিভাগের উপর দিয়ে ভূমির ঢাল অনুসরণ করে প্রধান নদী এবং তার বিভিন্ন উপনদী ও শাখানদী প্রবাহিত হয়, সেই অঞ্চলকে প্রধান নদীর অববাহিকা বলা হয়।

আমাজন নদীর অববাহিকা পৃথিবীর বৃহত্তম নদী-অববাহিকা (মোট ক্ষেত্রফল ৭০,৫০,০০০ বর্গ কিলোমিটার)।

জল বিভাজিকা: যখন কোনও উঁচু ভূমিভাগ দু’টি নদীর অববাহিকাকে ভাগ করে, তাকে জল বিভাজিকা বা নদী বিভাজিকা বলে।

এবার আমরা আলোচনা করব নদীর বিভিন্ন গতি নিয়ে।

নদীর উচ্চগতি বা পার্বত্য গতি: এই অবস্থায় নদীর প্রধান কাজ হল ক্ষয় ও বহন। এই গতিতে নদী বড় বড় পাথর বহন করে নিয়ে আসে। আর এই সব পাথরের ঘর্ষণে নদীর তলদেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তার ফলে বড় বড় গর্তেরও সৃষ্টি হয়। নদীর এই ক্ষয়ের ফলে গিরিখাত, ক্যানিয়ন এবং জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়।

নদীর মধ্যগতি বা সমভূমি প্রবাহ: এই অবস্থায় নদীর গতি একটু স্তিমিত হয়। নদীর বহন ক্ষমতাও কিছুটা কমে। সাধারণত নদী উপত্যকায় প্রবেশ করলে এই গতি বোঝায়।

নদীর নিম্নগতি বা ব-দ্বীপ প্রবাহ: সমভূমি প্রবাহের পর নদী যেখানে সমুদ্র বা হ্রদের অগভীর অংশে মেশে, তাকে বলে ব-দ্বীপ প্রবাহ। এই অবস্থায় নদীর ক্ষয় করার ক্ষমতা কমে যায়। তবে ভাঙার কাজ চলে। এই সময়ে নদীর গতি এতটাই কমে যায় যে, সামান্য বাধা পেলেই নদী নিজের গতিপথ পরিবর্তন করে ফেলে। এই অংশে নদীর গতিপথ আঁকাবাঁকা হয়। এই গতিপথেই অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের সৃষ্টি হয়।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৮ মার্চ ২০১৭

স্পেশাল টিউশন | বাংলা ব্যাকরণ

বাক্যের সংজ্ঞা, গুণ ও প্রকরণ

ভাষার মূল উপকরণ বাক্য এবং বাক্যের মৌলিক উপাদান শব্দ। যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোনও বিষয়ে বক্তার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় তাকে বাক্য বলে। কতগুলো পদের সমষ্টিতে বাক্য গঠিত হলেও যে কোনও পদসমষ্টিই বাক্য নয়। বাক্যের বিভিন্ন পদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বা অন্বয় থাকা আবশ্যক। এছাড়াও বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পদ দ্বারা মিলিতভাবে একটি অখণ্ড ভাব পূর্ণরূপে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন তবেই তা বাক্য হবে।

বাক্যের গুণ: ভাষার বিচারে বাক্যের তিনটি গুণ রয়েছে। যেমন– আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি, যোগ্যতা

বাক্যের প্রকরণ অংশ অনুসারে বাক্য দুই প্রকার। যেমন– উদ্দেশ্য ও বিধেয়

গঠন অনুসারে বাক্য তিন প্রকার। যেমন– সরল বাক্য, মিশ্র বা জটিল বাক্য ও যৌগিক বাক্য

অর্থ অনুসারে বাক্য পাঁচ প্রকার। যেমন– বিবৃতিসূচক, প্রশ্নোত্তরসূচক, আবেগসূচক/বিস্ময়সূচক, ইচ্ছাসূচক ও আদেশসূচক।

আকাঙ্ক্ষা: বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা তা হল আকাঙ্ক্ষা। যেমন– 'চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে'—এটুকু বললে বাক্যটি সম্পূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করে না, আরও কিছু ইচ্ছা থাকে। বাক্যটি এভাবে পূর্ণাঙ্গ করা যায়; চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। এখানে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়েছে বলে এটি পূর্ণাঙ্গ বাক্য।

আসত্তি (বাক্যের গুণ): মনোভাব প্রকাশের জন্য বাক্যে শব্দগুলো এমনভাবে পরপর সাজাতে হবে যাতে মনোভাব প্রকাশ বাধাগ্রস্ত না হয়। বাক্যের অর্থসংগতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই আসত্তি। যেমন– কাল বিতরণী হবে উৎসব স্কুলে আমাদের পুরস্কার অনুষ্ঠিত। লেখা হওয়াতে পদ সন্নিবেশ ঠিকভাবে না হওয়ায় শব্দগুলোর অন্তর্নিহিত ভাবটি যথাযথ প্রকাশিত হয়নি। তাই এটি একটি বাক্য হয়নি। মনোভাব পূর্ণভাবে প্রকাশ করার জন্য সকল পদকে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করতে হয়। যেমন– কাল আমাদের স্কুলে পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। বাক্যটি আসত্তিসম্পন্ন।

যোগ্যতা (বাক্যের গুণ): বাক্যস্থিত পদসমূহের অন্তর্গত এবং ভাবগত মেলবন্ধনের নাম যোগ্যতা। যেমন– বর্ষার বৃষ্টিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়। এটি একটি যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য। কারণ, বাক্যটিতে পদসমূহের অর্থগত এবং ভাবগত সমন্বয় রয়েছে। কিন্তু 'বর্ষার রৌদ্র প্লাবনের সৃষ্টি করে'– বললে বাক্যটি ভাবপ্রকাশের যোগ্যতা হারাবে। কারণ, রৌদ্র প্লাবন সৃষ্টি করে না।

শব্দের যোগ্যতার সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জড়িত থাকে–

ক) রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা: প্রকৃতি-প্রত্যয়জাত অর্থে শব্দ সর্বদা ব্যবহৃত হয়। যোগ্যতার প্রতি লক্ষ রেখে কতগুলো শব্দ ব্যবহার করতে হয়। যেমন–

শব্দ	রীতিসিদ্ধ	প্রকৃতি+প্রত্যয়	প্রকৃতি+প্রত্যয়জাত অর্থ
বাধিত	অনুগৃহীত বা কৃতজ্ঞ	বাধ+ইত	বাধাপ্রাপ্ত
তৈল	তিল জাতীয়	তিল+ষ্ণ	তিলজাত স্নেহ পদার্থ, বিশেষ কোনও শস্যের রস

খ) দুর্বোধ্যতা: অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যের যোগ্যতা বিনষ্ট হয়। যেমন– তুমি আমার সঙ্গে প্রপঞ্চ করেছ। (চাতুরি বা মায়া অর্থে কিন্তু বাংলা 'প্রপঞ্চ' শব্দটি অপ্রচলিত)।

গ) উপমার ভুল প্রয়োগ: ঠিকভাবে উপমা অলংকার ব্যবহার না করলে যোগ্যতার হানি ঘটে। যেমন– আমার হৃদয়-মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হল। বীজ ক্ষেত্রে বপন করা হয়, মন্দিরে নয়। কাজেই বাক্যটি হওয়া উচিত : আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে আশার বীজ উপ্ত হল।

ঘ) বাহুল্যদোষ: প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহারে বাহুল্যদোষ ঘটে এবং এর ফলে শব্দ তার যোগ্যতাগুণ হারিয়ে থাকে। যেমন: দেশের সব বোদ্ধাগণই এ-ব্যাপারে আমাদের সমর্থন দান করেন। 'বোদ্ধাগণ' বহু বচনবাচক শব্দ। এর সঙ্গে সব' শব্দটির অতিরিক্ত ব্যবহার বাহুল্যদোষ সৃষ্টি করেছে।

ঙ) বাগধারার শব্দ পরিবর্তন: বাগধারা ভাষাবিশেষের ঐতিহ্য। এর যথেচ্ছ পরিবর্তন করলে শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। যেমন: অরণ্যে রোদন (অর্থ : নিষ্ফল আবেদন)-এর পরিবর্তে যদি বলা হয়, 'বনে ক্রন্দন' তবে বাগধারাটি তার যোগ্যতা হারাবে।

চ) গুরুচণ্ডালী দোষ

তৎসম শব্দের সঙ্গে দেশীয় শব্দের প্রয়োগ কখনও কখনও গুরুচণ্ডালী দোষ সৃষ্টি করে। এ দোষে দুষ্ট শব্দ তার যোগ্যতা হারায়। গরুর গাড়ি', শবদাহ', মড়াপোড়া' প্রভৃতি স্থলে যথাক্রমে গরুর শকট', 'শবপোড়া', 'মড়াদাহ' প্রভৃতির ব্যবহার গুরুচণ্ডালী দোষ সৃষ্টি করে।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়: প্রতিটি বাক্যে দু'টি অংশ থাকে, উদ্দেশ্য ও বিধেয়।

বাক্যের যে অংশে কাউকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য বলে। আর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয় তাকে বিধেয় বলে। যেমন– খোকা এখন (উদ্দেশ্য) বই পড়ছে (বিধেয়)

বিশেষ্য বা বিশেষ্যস্থানীয় অন্যান্য পদ বা পদসমষ্টিযোগে গঠিত বাক্যাংশও বাক্যের উদ্দেশ্য হতে পারে। যেমন–

সব লোকেরাই প্রকৃত সুখী– বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত বিশেষণ

মিথ্যা কথা বলা খুবই অন্যায়– ক্রিয়াজাত বাক্যাংশ

উদ্দেশ্যের প্রকারভেদ

একটিমাত্র পদবিশিষ্ট কর্তৃপদকে সরল উদ্দেশ্য বলে। উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিশেষণাদি যুক্ত থাকলে তাকে সম্প্রসারিত উদ্দেশ্য বলে।

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারণ: ১) বিশেষণ যোগে– কুখ্যাত দস্যুদল ধরা পড়েছে। ২) সম্বন্ধ যোগে– রাহুলের ভাই এসেছে।

৩) সমার্থক বাক্যাংশ যোগে– যারা অত্যন্ত পরিশ্রমী তারাই উন্নতি করে। ৪) অসমাপিকা ক্রিয়াবিশেষণ যোগে– চাটুকার পরিবৃত হয়েই বড় সাহেব থাকেন। ৫) বিশেষণ স্থানীয় বাক্যাংশ যোগে– যার কথা তোমরা বলে থাকো তিনি এসেছেন।

বিধেয়ের সম্প্রসারণ: ১) ক্রিয়া বিশেষণ যোগে– ঘোড়া দ্রুত চলে। ২) ক্রিয়া বিশেষণীয় যোগে– জেট বিমান অতিশয় দ্রুত চলে। ৩.) কারকাদি যোগে– ভুবনের ঘাটে ঘাটে ভাসিছে। ৪) ক্রিয়া বিশেষণ স্থানীয় বাক্যাংশ যোগে– তিনি যেভাবেই হোক আসবেন। ৫) বিধেয় বিশেষণ যোগে– ইনি আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু (হন)।

সরল বাক্য: যে বাক্যে একটিমাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন– পুকুরে পদ্মফুল জন্মে। এখানে 'পদ্মফুল' উদ্দেশ্য আর 'জন্মে' বিধেয়।

এরকম: বৃষ্টি হচ্ছে। তোমরা বাড়ি যাও। বাবু আজ সকালে স্কুলে গিয়েছে। স্নেহময়ী জননী (উদ্দেশ্য) স্বীয় সন্তানকে প্রাণাপেক্ষা ভালোবাসেন (বিধেয়)। বিশ্ববিখ্যাত মহাকবিরা (উদ্দেশ্য) ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন লেখনী দ্বারা অমরতার সংগীত রচনা করেন। (বিধেয়)।

মিশ্র বা জটিল বাক্য: যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্যের এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয় তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। যেমন–

১) যে পরিশ্রম করে (আশ্রিত বাক্য) সেই সুখ লাভ করে (প্রধান খণ্ডবাক্য)।

২) সে যে অপরাধ করেছে (আশ্রিত বাক্য) তা মুখ দেখেই বুঝেছি (প্রধান খণ্ডবাক্য)।

৩) যেখানে আকাশ আর সমুদ্র (আশ্রিত বাক্য) একাকার হয়ে গেছে সেখানেই দিকচক্রবাল (প্রধান খণ্ডবাক্য)।

যৌগিক বাক্য: পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে।

জ্ঞাতব্য– যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত নিরপেক্ষ বাক্যগুলো এবং, ও, কিন্তু, অথবা, অথচ, কিংবা, বরং, তথাপি প্রভৃতি অব্যয় যোগে সংযুক্ত বা সমন্বিত থাকে। যেমন–

নেতা জনগণকে উৎসাহিত করলেন বটে কিন্তু কোনও পথ দেখাতে পারলেন না।

বস্ত্র মলিন কেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে সে ধোপাকে গালি পাড়ে অথচ ধৌত বস্ত্রে তাহার গৃহ পরিপূর্ণ।

উদয়াস্ত পরিশ্রম করব তথাপি অন্যের দ্বারস্থ হব না।

স্পেশাল টিউশন | কম্পিউটার

মাইক্রোসফট অ্যাকসেস

আগের সংখ্যার পর

পেজ কী?

ইন্টারনেটে মাইক্রোসফট একসেস বা SQL সার্ভারে সংরক্ষিত ডেটা নিয়ে কাজ করার জন্য ডেটাবেস একসেস পেজ তৈরি করা যায়। ডেটাবেস একসেস পেজ-এ ট্যাবের আওতায় সংরক্ষিত থাকে। একসেস পেজ মাইক্রোসফট একসেল বা এ জাতীয় অন্যান্য উৎসের ডেটা নিয়েও কাজ করা যায়।

ম্যাক্রো কী?

ম্যাক্রো হচ্ছে একধরনের ছোট প্রোগ্রাম। এই ট্যাবে ক্লিক করলে বর্তমান ডেটাবেসের সকল ম্যাক্রো প্রোগ্রামগুলোর তালিকা দেখা যায়। এখান থেকে কোন ম্যাক্রো সংশোধন বা নতুন ম্যাক্রো তৈরি করা যায়।

মাইক্রোসফট একসেস লে-আউট উইন্ডোর পরিচিতি: কম্পিউটার চালু হওয়ার পর Start > Programs/All Programs > Microsoft Access > Enter বার্টন/কি চাপলে অথবা মাউসের দ্বারা Microsoft Access এর উপর ক্লিক করলে মাইক্রোসফট একসেস প্রোগ্রামটি পর্দায় সচল হয়।

MS Access-এর লে-আউট উইন্ডতে টাইটেল বার, মেনু বার, ডাটাবেস টুলবার, স্ট্যাটাস বার, টাস্ক বার ইত্যাদি থাকে।

টাইটেল বার: উইন্ডোর শীর্ষদেশে মাইক্রোসফট একসেস লেখা লাইন বা বারকেই টাইটেল বার বলে।

মেনুবার: টাইটেল বারের নীচে File, Edit, View, Insert, Tool, Window, Help লেখা লাইন বা বারকে মেনুবার বলে।

টুলবার: সাধারণত টাইটেল বারের নীচে বিভিন্ন আইকন বা চিত্র সংবলিত বারকেই টুলবার বলে। মাইক্রোসফট একসেসে বিভিন্ন টুলবার রয়েছে। তারমধ্যে ডেটাবেস টুলবারটি ডিফল্ট হিসাবে সেট করা থাকে। টুলবার উইন্ড থেকে যে কোনও টুলবারকে অ্যাক্টিভ উইন্ডোতে হাইড বা ডিসপ্লে করানো যায়।

স্ট্যাটাস বার: উইন্ডোর নীচে স্টার্ট-আপ বা টাস্ক বারের উপরে যেখানে Ready (রেডি) লেখা থাকে তাকে স্ট্যাটাস বার বলে। এই বারে সর্বদা বিশেষ তথ্য দেখায়।

কন্ট্রোল মেনু: টাইটেল বারের শুরুতে চাবি চিহ্নিত বক্সে মাউসের ক্লিক করলে একটি মেনু দেখা যায়। একে কন্ট্রোল মেনু বলে।

ক্লোজ: টাইটেল বারের ডান পাশে ক্রস (X) চিহ্নিত বাটনকে ক্লোজ বাটন বলে। এই বাটনে ক্লিক করে চলমান উইন্ডো থেকে বের হওয়া যায়।

মিনিমাইজ: টাইটেল বারের ডান পাশে বিয়োগ (-) চিহ্নিত বাটনকে মিনিমাইজ বাটন বলে। উইন্ডোকে বড় থেকে ছোট করার জন্য এই বাটনে ক্লিক করতে হয়।

ম্যাক্সিমাইজ: টাইটেল বারের ডান পাশে বর্গাকার (□) চিহ্নিত বাটনকে ম্যাক্সিমাইজ বাটন বলে। উইন্ডোকে ছোট থেকে বড় করার জন্য এই বাটনে ক্লিক করতে হয়।

মাইক্রোসফট একসেস-এ একটি নতুন ডেটাবেস টেবিল তৈরি করার পদ্ধতি কী?

মাইক্রোসফট একসেসে দু'ভাবে টেবিল তৈরি করা যায়। টেবিল উইজার্ড (Table wizard) ডিজাইন ভিউ (Design view) থেকে।

টেবিল উইজার্ড-এ টেবিল তৈরি করার পদ্ধতি: ডেটাবেজ উইন্ড থেকে Create Table by using Wizard- এ ডবল ক্লিক করলে টেবিল উইজার্ড বক্স আসবে। উইজর্ডের বাঁদিকে Sample Table লেখা অংশে বিভিন্ন টেবিলের নাম থেকে প্রয়োজন মতো টেবিল নির্বাচন করতে হবে। এটা নির্বাচন করা হলে উইজার্ডের মাঝের অংশে এটির ফিল্ড সমূহ দেখা যাবে। সেখান থেকে পছন্দমতো ফিল্ড নির্বাচন করলে তা উইজার্ডের ডানপাশে প্রদর্শিত হয় এবং নতুন টেবিলের ফিল্ড নাম হিসাবে বিবেচিত হয়।

এরপর সাতের পাতায়

দোলা বন্দ্যোপাধ্যায়
তিরন্দাজ

আমি বরানগর রাজকুমারী মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে পড়তাম। ক্লাস থ্রি থেকে আমার খেলা শুরু। ক্লাস এইট-এ আমি ক্যাম্পে যোগ দিয়েছিলাম। সেই সময় তিন-চার মাস ক্যাম্পে থাকতে হতো। ওই সময় স্কুলে উপস্থিতি নিয়ে একটু সমস্যা হতো। তবে স্কুল টিচাররা এই ব্যাপারে আমায় খুব সাহায্য করতেন। বন্ধুরা নোটস দিত। আমি মাধ্যমিকের সময় টেস্ট দিতে না পারলেও স্কুল থেকে মাধ্যমিক দেওয়ার জন্য অ্যালাউ করেছিল।

মৌমা দাস
টেবল টেনিস প্লেয়ার

আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখনও খেলার জন্য বছরের অর্ধেক সময় বাইরে বাইরে কাটত। সেইভাবে স্কুল করতেই পারিনি। আমি বেথুন কলেজিয়েট স্কুলে পড়তাম। আমার স্কুল টিচাররা সেই সময় খুব সাহায্য করেছেন। আমার বেস্ট ফ্রেন্ড সৌম্যলিখা ভক্ত আমার জন্য সব নোটস রেখে দিত। ফলে পরীক্ষার সময় পড়তে সুবিধা হতো।

উত্তরণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৮ মার্চ ২০১৭

উত্তরণ এডু টিপস

ভালো ফল করতে হলে সব পরীক্ষায় গুরুত্ব দিতে হবে

সারা বছরের পরিশ্রমের মূল্যায়ন পাওয়া যায় বছরের শেষে পরীক্ষার রিপোর্ট কার্ডে। সবাই তার অপেক্ষায় থাকে। যদিও শুধু তা দিয়ে লেখাপড়ায় কে কত এলেমদার তা প্রমাণ হয় না। তবে ফাইনাল পরীক্ষা যদি মাথাব্যথার কারণ হয় তবে তার থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় হল সারা বছরে ওই পরীক্ষা নামক ঘটনাকে এতবার উপলব্ধি করা যে সব ভীতি দূর হয়ে যায়।

আসলে জীবনে একের পর এক অধ্যায় পার করার সময়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হতেই হবে। এই আমাদের সমাজব্যবস্থার নিয়ম। অনবরত যোগ্যতা প্রমাণ করে যাওয়া। এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাস। মাধ্যমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, জীবিকা এবং সেখানেও একের পর এক ধাপ পেরনো। তাই সবথেকে ভালো পরীক্ষাকে একটু সইয়ে নেওয়া। আমাদের সমাজে পরীক্ষা ও তার ফলাফল নিয়ে অযৌক্তিক মাথাব্যথা আর উদ্বিগ্নতার মানসিকতা তৈরি হয়ে আছে। এর ওপরেই যেহেতু জাগতিক উন্নতি ও সাফল্যের বিষয়গুলো নির্ভর করে তাই এই পরীক্ষা বিষয়টিকে নিয়ে অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাপানউতোর তৈরি হয়। আর তা পরীক্ষাকে ছাত্রজীবনেই শত্রুর রূপ দেয়। কিন্তু মুশকিল হল বিষয়টা এমন নয় যে, পরীক্ষা মানেই শুধু কোনও একজনের খামতি খুঁজে বার করা বরং কে কোন বিষয় কতটা জানে তা পরখ করাই তো উদ্দেশ্য। ভালো ফল করার আশায় বারেবারে খামতিগুলোকে নজরে এনে ছাত্রছাত্রীদের সাবধান করা হতে থাকে ফলে মনের মধ্যে বসে

যায় যে পরীক্ষা মানেই নিজের ফাঁকফোকর অন্যের সামনে তুলে এনে হেনস্থা করা।

তাই প্রথমে পরীক্ষার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো খুব দরকার। নিজেকে বুঝতে হবে যে, পরীক্ষা আসলে নিজেকে যাচাই করার একটা উপায়। সেটা সমানতালে করতে থাকলে মূল পরীক্ষায় নিজের ঘাটতি নিজেদের খুঁজে পেতেই নাজেহাল হতে হবে। তার মানেই ভালোভাবে পরীক্ষায় উতরে যাওয়া। তাই সবার প্রথমে পরীক্ষার প্রতি ভীতি, অনীহা, পালিয়ে যাওয়ার মানসিকতা বদলাতে হবে। তাতেই অর্ধেক কাজ হবে।

এমনিতে স্কুলগুলো এখন ক্লাসে সারপ্রাইজ টেস্ট, সাপ্তাহিক পরীক্ষা, মাসিক পরীক্ষা নিয়েই থাকে। যার যা নিয়মকানুন। তা ছাড়া ক্লাসে পরীক্ষা, বাড়িতে নিজে দেওয়া পরীক্ষা তো আছেই। এই সবকিছুকেই খুব গুরুত্ব দিতে হবে। অনেকেই ভাবে, বাড়ির পরীক্ষা তো, দিলেই হল। কী আর এমন ব্যাপার! ফলে পরীক্ষা দেওয়ার সময় দায়সারা ভাব তৈরি হয়। যা হোক একটা কিছু করে দেওয়ার প্রবণতা কাজ করে। তাতে কোনও উদ্দেশ্য সফল হয় না। উলটে নিজের ফাঁকফোকরগুলো টের পাওয়ার উৎযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়।

ছোট ছোট পরীক্ষাগুলো যত্নের সঙ্গে বারে বারে দিলে পড়াটাও ছোট ছোট ভাগে তৈরি হয়ে যায়। বারে বারে লেখালেখির ফলে যত্ন করে লিখে পরীক্ষা দিতে কোনও আলাদা করে পরিশ্রম করতে হয় না। সুন্দর খাতা সহজাতভাবেই তৈরি হয়। সব পরীক্ষা যত্নের সঙ্গে দিলে সুবিধে এটাই যে, পরীক্ষার দিন খুব আলাদা কিছু করতে যাচ্ছি বলে মনে হয় না। একটা স্বাভাবিক আচরণ এমনিতেই তৈরি হয়। ফলে ভালো ফল আরও সহজ হয়ে যায়।

নিজের সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা বেশ দরকার। যেটা এই ছোট ছোট পরীক্ষাগুলো থেকেই তৈরি হয়। নিজের লেখার গতি, অন্যমনস্কতার কারণে কী কী ধরনের ভুলভ্রান্তি হচ্ছে! পড়ার বিষয়ে বাস্তবিক ক্ষেত্রে কী কী মনে থাকছে, বা নিজের প্রকাশের ভঙ্গি ঠিক থাকছে কি না এসব একটা বিচার করার সুযোগ পাওয়া যায় পরীক্ষা থেকে। সময়ের মধ্যে উত্তর করতে পারা। নানারকম প্রশ্ন পড়ে তা ঠিকঠাক বোঝা হচ্ছে কি না তাও জানা যায়। তাই সব পরীক্ষাকে সমান গুরুত্ব দেওয়াই জীবনের যে কোনও পরীক্ষা ভালোভাবে দেওয়ার চাবিকাঠি।

ক্যুইজ [৬]

১) শিক্ষা,স্মৃতি, চিন্তা ইত্যাদি ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের কোন অংশ?
২) হাঙররা জল থেকে কীসের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন নেয়?
৩) মস্তিষ্কের আবরণীর নাম কী?
৪) জিনগত প্রযুক্তিতে তৈরি ইনসুলিনের বাণিজ্যিক নাম কী?
৫) কোন ভিটামিনের অভাবে ওজন হ্রাস পায়?
৬) হলুদ বর্ণের পরিপূরক রং কী?
৭) কিউসেক কী মাপার একক?
৮) ফল পাকাতে কোন হরমোন ব্যবহৃত হয়?
৯) দক্ষিণ আমেরিকার দেশ পেরুর প্রধান প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রের নাম কী?
১০) আফ্রিকায় কঙ্গো ও অ্যাঙ্গোলার মধ্য দিয়ে কোন নদী প্রবাহিত হয়েছে?
১১) আর্মেনিয়ার বড় শহর কোনটি?
১২) তৈলবীজ কী?
১৩) ভারতের কোথায় কোথায় সরিষার চাষ হয়?
১৪) দক্ষিণ ভিয়েতনামের বন্দর শহরের নাম কী?
১৫) ফ্লান্ডার্স কী?
১৬) বেরিং প্রণালি কী?
১৭) বাইট অব বেনিন কী?
১৮) ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গের নাম কী?
১৯) কলকাতায় পৃথিবীর আহ্নিক গতির বেগ ঘণ্টায় কত কিলোমিটার?
২০) বিষুব কথাটির অর্থ কী?
২১) ভূত্বক কাকে বলে?
২২) রিখটার স্কেল কটি মাত্রায় ভাগ করা থাকে?
২৩) পৃথিবীর দীর্ঘতম খাঁড়ি কোনটি?
২৪) বাংলাদেশের বৃহত্তম কৃত্রিম হ্রদের নাম কী?
২৫) ফ্ল্যাজেলিন কী?

গত সংখ্যার উত্তর:

১) ২ প্রকার। বিনাইন ও ম্যালিগন্যান্ট।
২) নর্মান আর্নেস্ট বোরলাগ।
৩) ফল।
৪) স্ফিগমো ম্যানোমিটার
৫) অক্সিন
৬) আয়রন
৭) হলোফাইটিক পুষ্টি।
৮) ক্যাশিমির ফ্রাঙ্ক
৯) অর্ধবৃত্তীয় গোলীয় দর্পণ।
১০) গ্রেগর জোহান মণ্ডল।
১১) ১০০০ বিলিয়ন।
১২) জলে ভাসমান আণুবীক্ষণিক জীব।
১৩) সিঙ্কোনা।
১৪) আমরুল শাক।
১৫) কুনো ব্যাঙ।
১৬) এফিড্রিন।
১৭) সুপারসনিক
১৮) প্রায় মাইনাস ২৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।
১৯) মিষ্টি।
২০) ৫৩৭ ক্যালোরি / গ্রাম।
২১) অগ্ন্যাশয়, লালাগ্রন্থি, বৃক্ক।
২২) মাছ।
২৩)অ্যাম্পিয়ার।
২৪) ফ্রানচিস গ্যালটন।
২৫) টোবাকো মোজেক ভাইরাস।

এই সংখ্যার প্রশ্নের উত্তর আগামী সপ্তাহে

পড়া মনে রাখার কৌশল

আগের সপ্তাহের পর

নিজের পড়া নিজের মতো করে: সাধারণত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রযোজ্য। তারা নিজের মতো করে একটি বিষয় বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে একটি নোটের মতো করে। এবং ওই নোটই তারা পরবর্তীতে পাঠ্যবই হিসাবে ব্যবহার করে। এতে সুবিধা হচ্ছে নোট করার সময় ছাত্র বা ছাত্রীকে ওই বিষয়টি বিভিন্ন বই থেকে একাধিকবার পড়তে হয়। ফলে বিষয়টি সম্পর্কে একটি ধারণা পরিষ্কার হয়। এবং এই পরিষ্কার ধারণার ওপরে সৃজনশীল পদ্ধতি ব্যবহার করে একজন ছাত্র বা ছাত্রী অনেক বেশি পড়া মনে রাখতে পারবে এবং অনেক বেশি মেধাবী বলে প্রমাণিত হবে।

নতুন-পুরনোর সংমিশ্রণ ও নিজের নোটের পাশাপাশি অন্য কিছু গ্রহণ করা: নতুন কিছু পড়া এবং শেখার সময় নিজস্ব নোটের পাশাপাশি নতুন ধারণাটিকে কোথাও নোট করতে হবে বা সযত্নে লালন করতে হবে। নতুন কিছু শেখার সময় একই রকম আরও বিষয় মিলিয়ে নিতে হবে। কারণ, একেবারে নতুন কোনও তথ্য ধারণ করতে মস্তিষ্ককে বেগ পেতে হয়। কিন্তু পুরনো তথ্যের সঙ্গে নতুন তথ্য সংযোজন করতে পারে খুব সহজে। উদাহরণস্বরূপ 'সিডি' শব্দটি শেখার ক্ষেত্রে পুরনো দিনের কলের গানের কথা মনে রাখলে শব্দটা সহজেই মনে থাকবে। শুধু মনে রাখতে হবে, শব্দ দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কী। ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রির নতুন কোনও সূত্র শেখার সময় মনে করে দেখতে হবে এ-ধরনের সূত্র আগে পড়া কোনও সূত্রের সঙ্গে মেলে কি না।

কেনর উত্তর খোঁজা

এটি একটি ভালো অভ্যাস। প্রতিটি অধ্যায়ের মধ্যে কী, কেন, কবে, কোথায়, কীভাবে এই জিনিসগুলো নিজে প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন সংযোগে জল হয় এই ফর্মুলাটিকেই কী, কেন, কীভাবে এরূপে মেধাবী ছাত্ররা মনে রাখার সহজ ফর্মুলা হিসাবে নিতে পারে। নিজের মনকে সবসময় নতুন কিছু জানার মধ্যে রাখতে হবে।

কল্পনায় ছবি আঁকা বা কাল্পনিকভাবে

গল্পের বিষয়ের সঙ্গে মূল ধারণাটি নিয়ে একটি কাল্পনিক ছবি বেশকিছু বার পড়লে অনুমান করা যায়। এই ছবিটির আকার, কৃতিত্ব একেক ছাত্রের জন্য একেক রকম। বিষয়টিকে কল্পনার ছবি আকারে যত বেশি বিস্তারিতভাবে আনা যাবে, বিষয়টির খুঁটিনাটি তত বেশি করে প্রকাশ হবে এবং ছাত্র তত বেশি নম্বর পাবে। এটি বিভিন্ন রচনামূলক বিষয়ে ব্যবহার করা যায়। বিষয়সদৃশ একটি ছবি আঁকতে হবে মনে। গল্পের প্রতিটি চরিত্রকে আশপাশের মানুষ বা বস্তুর সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে। তারপর সেই বিষয়টি নিয়ে পড়তে বসলে মানুষ কিংবা বস্তুটি কল্পনায় চলে আসবে। এ পদ্ধতিতে কোনও কিছু শিখলে সেটা ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। আর মস্তিষ্ককে যত বেশি ব্যবহার করা যায় তত ধারালো হয় ও পড়া বেশি মনে থাকে।

পড়ার সঙ্গে লেখা

কোনও বিষয় পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে সেটি খাতায় লিখতে হবে। একবার পড়ে কয়েকবার লিখলে সেটা সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয়। পড়া ও লেখা একসঙ্গে হলে সেটা মুখস্থ হবে তাড়াতাড়ি। পরবর্তী সময়ে সেই প্রশ্নটির উত্তর লিখতে গেলে অনায়াসে মনে আসে। এ পদ্ধতির আরেকটি সুবিধা হচ্ছে হাতের লেখা দ্রুত করতে সাহায্য করে। পড়া মনে রাখতে হলে শেখার সঙ্গে সঙ্গে বেশি বেশি লেখার অভ্যাস করতে হবে। সাধারণত কোনও বিষয়ে পড়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার লিখতে হয়। আবার ২৪ ঘণ্টা পরে ওই বিষয়টি আবারও পড়তে হয় এবং পরে লিখতে হয়। কিছুদিন পরপর বিষয়টি পড়া বা লেখার ওপরেই নির্ভর করে কতটুকু মনে রাখার সামর্থ্য রয়েছে। তবে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখার চেষ্টা অত্যন্ত উপকারী পদক্ষেপ।

অর্থ জেনে পড়া

ইংরেজি পড়ার আগে শব্দের অর্থটি অবশ্যই জেনে নিতে হবে। ইংরেজি ভাষা শেখার প্রধান শর্ত হল শব্দের অর্থ জেনে তা বাক্যে প্রয়োগ করা। বুঝে না পড়লে পুরোটাই বিফলে যাবে। সৃজনশীল পদ্ধতিতে ইংরেজি বানিয়ে লেখার চর্চা করা সব থেকে জরুরি। কারণ পাঠ্যবইয়ের যে কোনও জায়গা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে। ইংরেজি শব্দের অর্থভাণ্ডার সমৃদ্ধ হলে কোনও পড়া ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না। শুধু ইংরেজি নয় বাংলা কিংবা অন্য ভাষাতেও অর্থ বুঝে না পড়লে পড়া মনে থাকে না এবং সৃজনশীল হওয়া যায় না। পড়া মনে রাখার জন্য পাঠ্যপুস্তকের অক্ষরগুলোর মানে জানা ছাড়াও মেধাবী ছাত্র সবসময় প্রতিদিন ৫টি করে নতুন শব্দ মনে রাখার চেষ্টা করবে মানে সহকারে। এতে করে ছাত্রছাত্রীদের শব্দভাণ্ডার বাড়বে।

গল্পের ছলে পড়া বা ডিসকাশন

যে কোনও বিষয় ক্লাসে পড়ার পর সেটা আড্ডার সময় বন্ধুদের সঙ্গে গল্পের মতো করে উপস্থাপন করতে হবে। সেখানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের মনের ভাবগুলো প্রকাশ করতে পারবে। সবার কথাগুলো একত্র করলে অধ্যায়টি সম্পর্কে ধারণাটা স্বচ্ছ হয়ে যায়। কোনও অধ্যায় খণ্ড খণ্ড করে না শিখে আগে পুরো ঘটনাটি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নিতে হবে। পরে শেখার সময় আলাদাভাবে মাথায় নিতে হবে। তাহলে যে কোনও বিষয় একটা গল্পের মতো মনে হবে।

মুখস্থবিদ্যাকে 'না'

মুখস্থবিদ্যা চিন্তাশক্তিকে অকেজো করে দেয়, পড়াশোনার আনন্দও মাটি করে দেয়। কোনও কিছু না বুঝে মুখস্থ করলে সেটা বেশিদিন স্মৃতিতে ধরে রাখা যায় না। কিন্তু তার মানে এই নয়, সচেতনভাবে কোনও কিছু মুখস্থ করা যাবে না। টুকরো তথ্য যেমন– সাল, তারিখ, বইয়ের নাম, ব্যক্তির নাম ইত্যাদি মনে রাখতে হবে– কী মনে রাখছ, এর সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের কী সম্পর্ক তা খুঁজে বের করতে হবে। এছাড়া বিজ্ঞানের কোনও সূত্র কিংবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আয়ত্ত করতে সেটা আগে বুঝে তারপর মুখস্থ করতে হবে। মুখস্থবিদ্যা একেবারেই যে ফেলনা তা নয়। এটি অনেক ক্ষেত্রে কার্যকরও বটে। তবে সৃজনশীলতার যুগে মুখস্থবিদ্যার চেয়ে কাল্পনিকভাবে লেখা, নিজের মতো করে লেখা অত্যন্ত মেধাবী কাজ।

যে কোনও বিষয়ে বলা যত সহজ ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করা ততটা সহজ নয়। এখানে যেসব পদ্ধতির কথা বলা হল সবগুলোই যে তোমরা নিজেদের মতো করে প্রয়োগ করতে পারবে তা নয়। আস্তে আস্তে চেষ্টা করলে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে পড়া মনে রাখা যায়। মনে রাখতে হবে জিনিসটা বুঝে পড়া আর মুখস্থ করার মধ্যে অবশ্যই তফা রয়েছে। যারা বুঝে পড়ে তারা মুখস্থ করা ছাত্রছাত্রীর চেয়ে বেশি মনে রাখতে পারে এবং মেধাবী হয়।

উত্তরণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২৮ মার্চ ২০১৭

বিতর্ক যখন শিক্ষা নিয়ে | আজকের বিষয়: গল্পের বই পড়া

আমাদের মনটা আসলে একটা বেলুনের মতো। যদি তাতে হাওয়া না ভরো, সেটা চুপসে ছোট্ট হয়ে থাকে। কিন্তু যত হাওয়া ভরবে, বেলুনটা ততই বড় হতে থাকবে। এটাকে মনের প্রসার বলে। সাহিত্যপাঠে মনের যতখানি প্রসার হয়, তেমনটা আর কিছুতে নয়। যত পড়বে, দেখবে ততই তোমার চিন্তাভাবনা প্রসারিত হচ্ছে, বড় করে ভাবতে পারছ, নতুন নতুন বিষয়ে আগ্রহ তৈরি হচ্ছে। আর পাঁচজনের চেয়ে অন্য ভাবে ভাবতে পারছ। তোমার স্কুলের পড়াশোনার ওপরও এর প্রত্যক্ষ সুপ্রভাব পড়বে। কিন্তু তারচেয়েও বেশি এর পরোক্ষ প্রভাব। এখন প্রত্যেকেই একটা দ্বিধায় থাকে যে এই গল্পের বইয়ের প্রতি আকর্ষণ লেখাপড়ার ক্ষতি করবে না তো? তুমি যেমন কেরিয়ার চাও, সেটার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না তো? আশঙ্কাটা যে একেবারে অমূলক, তা বলব না। গল্পের বই যাদের টানে, তারাই জানে যে সেই টান কত জোরদার। কাজেই, তোমাদের লেখাপড়া আর বাইরের বই পড়া এই দুটোর মধ্যে একটা ভারসাম্য আনতে হবে। সেটা করার অনেক উপায় হতে পারে। ধরো, একটা উপন্যাস পড়ছ। সেটা পড়ার পর পরের উপন্যাসটা তখনই ধরে ফেলো না। দিন তিনেক অপেক্ষা করো। সেই ফাঁকে শুধু লেখাপড়া করো। নিজের জন্য টার্গেট ঠিক করে নাও। নিজেকে বলো, ইতিহাসের দুটো অধ্যায়, অঙ্কের দুটো অধ্যায় শেষ করার পর, তার উত্তর তৈরি করার পর আবার পরের উপন্যাসটা ধরব। নিজেকে ফাঁকি দিও না। পড়া তৈরি হওয়ার পরেই আবার গল্পের বইয়ে হাত দাও। যেহেতু গল্পের বই পড়ার জন্য তোমাদের তীব্র ইচ্ছে হবে, সেই ইচ্ছেটাই তোমাদের লেখাপড়াকেও এগিয়ে নিয়ে যাবে।

নিজের জন্য পুরস্কার আর শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারলে, আর সেই ব্যবস্থা মেনে চলতে পারলে দারুণ হয়। ধরো ঠিক করলে, সামনের পরীক্ষায় অঙ্কে অন্তত ৯৫ পেতেই হবে। যদি পাও, তা হলে নিজেকে একটা বাড়তি বই পড়ার সুযোগ দেবে। আর যদি না পাও, তবে গল্পের বইয়ের তালিকা থেকে একটা বই কাটা যাবে সেই সময়টা পড়াশোনার জন্য ব্যবহার করবে। নিজেকে মোটিভেট করতে পারা খুব জরুরি। এটা যে যেমনভাবে পারে, করে। তোমরা গল্পের বই পড়াটাকেই নিজের মোটিভেশন হিসাবে ব্যবহার করতে পারো।

তবে, পড়ার অভ্যাসটা ছেড়ো না যেন। আজকের পড়া তোমার ভবিষ্যতে প্রচুর কাজে লাগবে। তোমার চারপাশের লোকজনের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকবে তুমি।

অভিজিৎ তপাদার (শিক্ষক)

স্টুডেন্ট লাইফের একটা অঙ্গই হল গল্পের বই পড়া। এতে নিয়মিত পাঠাভ্যাস ও অধ্যাবসায়ের ক্ষমতা তৈরি হয়। বইয়ের প্রতি ভালোবাসা জন্মায়। আমরা আমাদের স্কুল লাইব্রেরিতে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করি ছাত্রদের পছন্দের বই আনতে। যাতে তারা আরও আগ্রহী হয়। নিয়মিত গল্পের বই পড়লে একটি ছাত্রের ভাষা-জ্ঞান বাড়ে, শুধু তাই নয় রুচিবোধ তৈরিতেও গল্পের বইয়ের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

শুভ্র রায় (ছাত্র)

আমার গল্পের বই পড়তে খুব ভালো লাগে। টিভি দেখা, ভিডিও গেম খেলার পাশাপাশি গল্পের বই পড়াটাও আমার ভীষণ নেশা। গোয়েন্দা গল্প পেলে তো কোনও কথাই নেই। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়েই চলেছি। আশেপাশে কোনও ভ্রুক্ষেপ থাকে না।

পুলক প্রধান (অভিভাবক)

অনেকেই ভাবেন পড়ার বইয়ের বাইরের কোনও বই পড়ছে মানে ছেলে সময় নষ্ট করছে। সেক্ষেত্রে আমার আপত্তি রয়েছে। শুধু ছাত্রজীবন কেন আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এই বই পড়ার অভ্যাস তৈরি হওয়াটা খুব জরুরি। ছাত্রজীবন চরিত্রগঠনের সময় জীবনগঠনের সময়। তাই এই সময়ে অবসরের সঙ্গী গল্পের বইয়ের বিকল্প আর কিছুই হতে পারে না। কারণ গল্পের বই পড়ার মাধ্যমে শুধু বাইরের জগৎ সম্পর্কে সম্যক ধারণা তৈরি হয় তাই নয়, মনোযোগ দিয়ে বই পড়ার অভ্যাসও তৈরি হয়। তৈরি হয় একাগ্রতা ও ধৈর্যশক্তি। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, অভিভাবকরাই পারেন তার ছেলেমেয়ের এই সু-অভ্যাস তৈরি করতে। ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াম চারিদিকে যদিওবা গ্রাস করে নিয়েছে, তবুও একথা মানতেই হবে, নতুন বইয়ের গন্ধ নিতে নিজের বাচ্চাকে না শেখানোটা অভিভাবকদেরই ব্যর্থতা।

স্কুলে শিক্ষার্থীদের শাস্তি...

প্রথম পাতার পর

একাংশ শিক্ষক মনে করেন, যে স্কুলে অপরাধের জন্য শাস্তি দিলে শিক্ষার্থীর মঙ্গল হয়, পড়াশুনায় সে মনোযোগী হয়। তেমনি আবার অনেক অভিভাবকও শিক্ষকদের কাছে তাদের বাচ্চার নামে নালিশ দিয়ে আসেন বেশি করে শাসন করার জন্য, বলে আসেন শাস্তি দিতে যাতে বাচ্চার ভালো হয়। অথচ তারা জানেন না, শিশুদের জন্য কত ভয়াবহ অমঙ্গল ডেকে আনছেন তাঁরা। এমনকি, অনেক শিক্ষিত অভিভাবকেরও এই বিষয়ে অজ্ঞতা এবং সচেতনতার অভাব লক্ষ করা যায়।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে, নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য শিক্ষকদেরই এগিয়ে আসতে হবে সবার আগে। শিশুরা যখন স্কুলে যায়, তখন তারা পরিচিত ক্ষুদ্র গন্ডী ছেড়ে বৃহত্তর পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকের কোনও অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ শিশুর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। একে শিশু তার শিক্ষকের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে আর শিক্ষকের প্রতি আস্থা না থাকলে শিশুরা শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহী হয়ে পড়ে। শিক্ষাদান পেশায় নিয়োজিতদের সহজেই শিক্ষার্থীর মনস্তত্ব বুঝতে পারা উচিত। তবেই শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়, যা স্থাপন করাই একজন দায়িত্বশীল এবং আদর্শ শিক্ষকের কর্তব্য।

যে কারণগুলোর জন্য আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শাস্তি রোহিত করা যাচ্ছে না

১) ঐতিহ্য: আমাদের দেশের ঐহিত্যবাহী গুরু-শিষ্য সম্পর্কের এটি ছিল এক অপরিহার্য অঙ্গ। শিষ্য গুরুর সব আদেশ পালন করতেন এবং গুরু শিষ্যকে শিক্ষা দিতেন। এই জন্যই তিনি শিষ্যকে যে কোনও ধরনের শাস্তি দেওয়ার অধিকার রাখতেন। এই ঐহিত্য থেকে হঠাৎ করে একদিনে বের হওয়া সম্ভব নয়। এখনও এই ধারণাই অনেকাংশে কাজ করে।

২) সমাজের চাপ: শারীরিক শাস্তির মাত্রা বেশি হলে অধিকাংশ অভিভাবকে প্রতিবাদী ভূমিকায় দেখা যায়। তবে কারও কারও কাছে বিস্ময়কর ঠেকলেও, এটাও সত্যি যে নিজের সন্তানকে শাস্তি প্রদানের জন্য শিক্ষকদের উপর চাপ প্রয়োগ করেন এমন মানুষ আমাদের সমাজের ভেতরই বিদ্যমান। ধরুন, একজনের ছেলে খুব দুষ্টু। তাই তিনি স্কুলে শিক্ষকদের চাপ দেন যাতে ছেলেকে মারধর করে শান্ত করে রাখেন। আর পরবর্তীতে ওই শিক্ষকের ভয় দেখিয়েই ছেলেকে ঘরেও শান্ত রাখা যায়।

৩) শিক্ষার্থীর সমস্যামূলক আচরণ: ভারতবর্ষে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষককে পাঠদান করতে হয় বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে। তাদের মাঝে কিছু শিক্ষার্থী সমস্যামূলক আচরণ করতেই পারে। কিন্তু শিক্ষার্থীর এই আচরণ শিক্ষককে বিব্রত করে তোলে। পাঠদান একটি জটিল কাজ। স্বল্পমেয়াদী (৩০-৪০ মিনিট) একটি ক্লাসে শিক্ষককে অনেক কাজ করতে হয়। শিক্ষককে সচেতন থাকতে হয় পাঠের উদ্দেশ্যের দিকে। আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞান তাঁকে নানা রকমের শিক্ষণ পদ্ধতির সুসমন্বয়করণের কঠিন দায়িত্বও দিয়ে রেখেছে। তাছাড়া, এসব কিছুর পাশাপাশি তাঁকে ঘড়ির কাঁটার দিকেও নজর রাখতে হয়। এমন জটিল অবস্থায় শিক্ষার্থীরা এক বা একাধিক সমস্যামূলক আচরণ করলে শিক্ষক উভয় সংকটে পড়ে যান। সমস্যামূলক আচরণের প্রতিবিধান না করলে ক্লাসের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়, শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর প্রতিবিধান যদি এমন মাত্রায় হয় যা সমস্যামূলক আচরণকারীদের জন্য ক্ষতিকর তাহলেও তো ঝামেলা। এমতাবস্থায়, মেপে মেপে সঠিক মাত্রার প্রতিবিধান করা একটি কঠিন কাজই বটে।

আমাদের দেশে প্রচলিত ধারণা এবং অন্ধবিশ্বাসের কারণে শিশু, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শাস্তি বিষয়গুলো ভুলভাবে উপস্থপিত এবং ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশুদের শাস্তি বন্ধে যথেষ্ট আন্তরিক এবং শিশু আইনের যথাযত প্রয়োগে আগ্রহী। এখন শুধু প্রয়োজন সকলের মধ্যে এই বিষয়ে সচেতনতা। শিক্ষক যাতে শিশুদের মনস্তত্ব বুঝতে পারেন, এ জন্য তাদের ট্রেনিং দেওয়া যেতে পারে। গণমাধ্যমও এই ক্ষেত্রে রাখতে পারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সৃষ্টিতে একমাত্র গণমাধ্যমই রাখতে পারে অনবদ্য ভূমিকা। শাস্তির ইতিবাচক দিক বিষয়ে অভিভাবকদের মনোভাবের পরিবর্তন প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের মঙ্গলের নামে অমঙ্গলের যে নিয়ম এবং ধারা আমরা সৃষ্টি করেছি, সে ফাঁদে যে আমরা এবং আমাদের শিশুরাই আটকে যাচ্ছে, এ বিষয়ে আমাদের সচেতন হতে হবে। আমাদের শিশুরা ফুলের মত হেসে ঠবে শিক্ষাঙ্গনে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে তাদের সবচেয়ে পছন্দের ও আনন্দের জায়গা- এমন অঙ্গীকারে প্রত্যয়ী হলে আমাদের শিশুদের সুস্থ, সুন্দর মনোযোগী এবং আদর্শ শিশু হতে সময় লাগবে না মোটেই। নিয়মের বেড়াজালে আটকে ফেলার আগেই আমাদের শিশুরাই আমাদের বেঁধে ফেলবে তাদের আলো ঝলমলে মুখর করা হাসির ছোঁয়াতে— এমন ছবি কে না দেখতে চায়...

'উত্তরণ' সম্পর্কে মতামত জানিয়ে মেল করার সময় নাম ও ঠিকানা লিখবে।

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

(প্রথম পাতার পর)

আবার সাধারণ বা কম মেধার ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে বর্তমান পাঠ্যক্রম অনেকটাই দুরূহ বোঝা হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে বেশি মনোযোগ ও প্রচুর অনুশীলনের প্রয়োজন। শিক্ষক-শিক্ষিকারও একটা বড় ভূমিকা রয়েছে ছাত্রছাত্রীর সাফল্যের পিছনে। আন্তরিক প্রচেষ্টায় ক্রমাগত উৎসাহ দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পাঠমুখী করে তুলতে হবে। পাঠানুরাগ জাগিয়ে তুলতে হবে। বিদ্যালয়ের শৈক্ষিক পরিবেশ যেন কোনওভাবেই দূষিত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। শিক্ষক যেন ভয়ের কারণ না হয়ে ওঠেন। ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে দূরত্ব যেন তৈরি না হয়। অভিভাবকেরও সহযোগিতা প্রয়োজন। প্রাইভেট শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে নিজেরা উদাসীন হয়ে থাকলে চলবে না।

দিনরাত বইয়ে মুখ গুঁজে থাকলে বা অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করলেও লেখাপড়ায় অনীহা জন্মাতে পারে। মাঝে মাঝে খেলাধুলো, গানবাজনায়ও উৎসাহ দেওয়া উচিত। অসুস্থ শরীরে বেশিক্ষণ পাঠ-অভ্যাস করা যায় না। তাই শরীর সুস্থ রাখতে হবে। নিয়মিত মিনিট দশেক করে মেডিটেশন করে একাগ্রতা ও স্মরণশক্তি বাড়ানো যেতে পারে। রোজকার পড়া রোজ তৈরি করে নিতে হবে এবং প্রচুর লেখার অভ্যেস করতে হবে। পুরনো পড়া মাঝে মাঝে ঝালিয়ে নিতে হবে। প্রতিদিন রুটিন মাফিক প্রতিটি বিষয় অল্প হলেও পড়তে হবে। পড়া জমিয়ে রাখতে নেই। পরীক্ষা চলাকালীন রাত জাগা কিংবা নতুন পড়া মুখস্থ করা অনুচিত। সর্বোপরি জরুরি পরামর্শ হল, নিয়মিত একাগ্রতা সহকারে পাঠাভ্যাস প্রয়োজন।

স্পেশাল টিউশন: কম্পিউটার

(পাঁচের পাতার পর)

ফিল্ড নির্বাচন করা: ফিল্ড নির্বাচিত করা হলে নির্বাচিত ফিল্ডসমূহ Field in my new table বক্সের মধ্যে প্রদর্শিত হবে।

> চিহ্নিত বোতাম ক্লিক করে একটি ফিল্ড নির্বাচন করা যায়।

>> চিহ্নিত বোতাম ক্লিক করে সকল ফিল্ড একসঙ্গে নির্বাচন করা যায়।

< চিহ্নিত বোতাম ক্লিক করে একটি ফিল্ড বাতিল করা যায়।

<< চিহ্নিত বোতাম ক্লিক করে সকল ফিল্ড বতিল করা যায়।

উইজার্ডের বাম অংশ থেকে Student নির্বাচন করে মাঝের অংশে যথাক্রমে StudentID, First Name, Address, City, Student Number ফিল্ডগুলোতে ডবল ক্লিক করে তা নির্বাচিত করে Finish বার্টনে ক্লিক করলে Student নামে একটি টেবিল তৈরি হবে।

ডিজাইন ভিউ-এ টেবিল তৈরির পদ্ধতি:

ডেটাবেস উইন্ড থেকে টেবিল ট্যাব নির্বাচন করে ডবল ক্লিক করলে ডিজাইন ভিউ আসবে।

ফিল্ড নেম কলামের প্রথম রো থেকে পর্যায়ক্রমে StudentID, First Name, Address, City, Student Number ইত্যাদি লিখতে হবে। Data Type হিসাবে Text নির্বাচন করতে হবে।

টেবিল Save করার জন্য ফাইল মেনু থেকে Save অপশনে ক্লিক করলে Save As ডায়ালগ বক্স আসবে টেবিলের নাম লিখে OK বাটনে ক্লিক করে প্রাইমারি কী জন্য ইয়েস/নো লেখা ডায়ালগ বক্স আসবে এখান থেকে ইয়েস সিলেক্ট করে ওকে বাটনে ক্লিক করলে সেভ হবে। এবার ফাইল মেনু থেকে Close অপশনে ক্লিক ফাইলটি বন্ধ করতে হবে।

এরপর ফাইলটি অর্থাৎ তৈরি করা টেবিলটি ওপেন করে প্রয়োজনীয় ডাটা এন্ট্রি করলেই ডিজাইন ভিউ-এ একটি ডাটা টেবিল তৈরি হল।

এরপর পরের সপ্তাহে

উত্তরণ

যুগশঙ্খ SUPPLI

মঙ্গলবার, ২৮ মার্চ ২০১৭

TEAM উত্তরণ

শর্মিলা চন্দ্র
(কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর)

তনুশ্রী দাস | সালমা আহমেদ
বিদিশা রায়চৌধুরী (গুয়াহাটি)
এনায়তি দেবদত্ত (শিলচর)

ভারতের একমাত্র বাংলা দৈনিক
যুগশঙ্খ
পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বাঙালিকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে

নিষিদ্ধ দেশ তিব্বত

নিষিদ্ধ দেশ কোনটি প্রশ্ন করলে একবাক্যে সবাই বলবে তিব্বত। কিন্তু এই নিষিদ্ধের পিছনের রহস্য অনেকেরই অজানা। শত শত বছর ধরে হিমালয়ের উত্তর অংশে দাঁড়িয়ে আছে তিব্বত নামের এই রহস্যময় রাজ্যটি। তিব্বতে যে কী আছে সে ব্যাপারে সবার মনে রয়েছে জিজ্ঞাসা।

হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত ছোট একটি দেশ তিব্বত। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ত্রয়োদশ দালাইলামা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গণচিনের একটি স্বশাসিত অঞ্চল তিব্বত। মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত এই অঞ্চলটি তিব্বতীয় জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল। এই অঞ্চলটি চিনের অংশ হলেও এখানকার অনেক তিব্বতি এই অঞ্চলকে চিনের অংশ মানতে নারাজ। ১৯৫৯ সালে গণচিনের বিরুদ্ধে তিব্বতিরা স্বাধিকার আন্দোলন করলে সেটি ব্যর্থ হয়। তখন দালাইলামার নেতৃত্বে অসংখ্য তিব্বতি ভারত সরকারের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক হিমাচলপ্রদেশের ধর্মশালায় বসবাস শুরু করেন। সেখানে স্বাধীন তিব্বতের নির্বাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

তিব্বতের অজানা রহস্যর পিছনে এর প্রকৃতি ও দুর্গম পরিবেশ অনেকাংশে দায়ী। রাজধানী লাসা থেকে মাত্র ১০০ কিলোমিটার দূরে গোবি মরুভূমি। মরুভূমির নিষ্ঠুর ও কষ্টদায়ক পরিবেশ এসব এলাকার মানুষকে কাছে আনতে নিরুৎসাহিত করে। তিব্বতের বেশিরভাগ ভূভাগ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৬০০০ ফুটেরও ওপরে অবস্থিত হওয়ায় সেখানে বসবাস করা পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের চেয়ে একটু বেশি কষ্টকর। এই অঞ্চলগুলো এতই উঁচু যে, একে পৃথিবীর ছাদ বলা হয়ে থাকে। তিব্বতের স্থলভাগ বছরের প্রায় আট মাস তুষারে ঢেকে থাকে। সেই প্রাচীনকাল থেকেই তিব্বতকে ঘিরে প্রচলিত রয়েছে অনেক রহস্য। তিব্বতের রাজধানী লাসা বিশ্বব্যাপী নিষিদ্ধ নগরী হিসাবে পরিচিত ছিল অনেক আগে থেকেই। লাসায় বহির্বিশ্বের কোনও লোকের প্রবেশাধিকার ছিল না। দেশটি পৃথিবীর অন্য সব অঞ্চল থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন ছিল। তিব্বত বা লাসায় বাইরের বিশ্ব থেকে কারও প্রবেশ করার আইন না থাকায় এই অঞ্চলটি দীর্ঘদিন ধরে সবার কাছে একটি রহস্যময় জগৎ হিসাবে পরিচিত ছিল। কী আছে লাসায়, সেটা দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত সমগ্র বিশ্ব। লাসার জনগোষ্ঠী, শহর, বন্দর, অট্টালিকা সবকিছুই ছিল সবার কাছে একটি রহস্যঘেরা বিষয়। লাসা নগরীতে ছিল বিখ্যাত পোতালা নামক একটি প্রাসাদ। এই প্রাসাদটি প্রথমবারের মতো বহির্বিশ্বের মানুষেরা দেখতে পায় ১৯০৪ সালে। আমেরিকার বিখ্যাত ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক পত্রিকায় এই বিখ্যাত অট্টালিকার ছবি ছাপা হয়। তিব্বতের চতুর্দিকে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়েছিটিয়ে আছে অসংখ্য পাহাড় ও গুহা। সেই পাহাড়ি গুহাগুলোতে বাস করে বৌদ্ধ পুরোহিত লামারা।

তিব্বতিরা অত্যন্ত ধর্মভীরু। তাদের মধ্যে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। তাদের প্রধান ধর্মগুরুর নাম দলাইলামা। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা তিব্বতে লামা নামে পরিচিত। লামা শব্দের অর্থ সর্বপ্রধান, আর দালাই শব্দের অর্থ জ্ঞান সমুদ্র। অর্থা দালাইলামা শব্দের অর্থ হচ্ছে জ্ঞান সমুদ্রের সর্বপ্রধান। ধর্মগুরু বা দালাইলামা বাস করে সোনার চূড়া দেওয়া পোতালা প্রাসাদে। ১৩৯১ সালে প্রথম দালাইলামার আবির্ভাব ঘটে। দালাইলামাকে তিব্বতিরা বুদ্ধের অবতার মনে করে থাকে। তিব্বতিদের বিশ্বাস, যখনই কেউ দালাইলামার পদে অভিষিক্ত হয় তখনই ভগবান বুদ্ধের আত্মা তার মধ্যে আবির্ভূত হয়। এক দালাইলামার মৃত্যুর পর নতুন দালাইলামার নির্বাচন হয়। দালাইলামা নির্বাচনের পদ্ধতিটাও বেশ রহস্যময় এবং রোমাঞ্চকর।

তিব্বতিদের দালাইলামা বা নেতা নির্বাচনের পদ্ধতিটি খুবই বিচিত্র। তিব্বতি প্রথা মতে, কারও মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তার মরদেহের সৎকার করা হয় না। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মৃত্যুর পরও আত্মা জাগতিক পরিমণ্ডলে বিচরণ করে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মা জাগতিক পরিমণ্ডল ত্যাগ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মরদেহটি তাদের বাড়িতে রেখে দেয়। কোনও লামার মৃত্যু হলে লাসার পূর্বে লহামপূর্ণ সরোবরের তীরে লামারা ধ্যান করতে বসে। ধ্যানযোগে লামারা দেখতে পায়, সেই সরোবরে স্বচ্ছ জলের ওপর ভেসে উঠছে একটি গুহার প্রতিবিম্ব। যে গুহার পাশে আছে একটি ছোট্ট বাড়ি। প্রধান লামা তার সেই অলৌকিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এঁকে দেবে নতুন দালাইলামার ছবি। বড় বড় লামারা সেই ছবির তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করবে। তারপর কয়েকজন লামা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে তিব্বতের বিভিন্ন স্থানে যায় শিশু অবতারের খোঁজে। তারা তিব্বতের ঘরে ঘরে গিয়ে সেই ছবির হুবহু শিশুটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। আর এভাবেই তারা খুঁজে বের করে তাদের নতুন দালাইলামাকে।

তিব্বতের লামারা– সহ সাধারণ মানুষেরাও প্রেতাত্মাকে খুবই ভয় পায়। তারা সবসময় প্রেতাত্মার ভয়ে আড়ষ্ট থাকে। অধিকাংশ তিব্বতির ধারণা, মানুষের মৃত্যুর পর দেহের ভেতর থেকে প্রেতাত্মারা মুক্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। ওই প্রেতাত্মার লাশ সৎকার হওয়ার আগে পর্যন্ত সে মানুষের ক্ষতি করার জন্য ঘুরে বেড়ায়। তারা কখনও মানুষের ওপর ভর করে, কখনও পশু-পাখি কিংবা কোনও গাছ অথবা পাথরের ওপরও ভর করে। প্রেতাত্মাদের হাত থেকে বাঁচতে ও প্রেতাত্মাদের খুশি রাখতে তিব্বতিরা পূজা করে থাকে।

তিব্বতে সরকারি ভাষা হিসাবে চিনা ভাষার প্রচলন থাকলেও তিব্বতিদের ভাষার সুপ্রাচীন ইতিহাস আছে। তাই চিনের বেশ কিছু প্রদেশ এবং ভারত, পাকিস্তান, নেপাল ও ভুটানে তিব্বতি ভাষাভাষী মানুষ রয়েছে।

তিব্বতিদের সবচেয়ে ব্যতিক্রমী আচার হল মৃতদেহের সৎকার। এদের মৃতদেহ সৎকার পদ্ধতি খুবই অদ্ভুত। কোনও তিব্বতি যদি মারা যায়, তবে ওই মৃতদেহ কাউকে ছুঁতে দেওয়া হয় না। ঘরের এক কোণে মৃতদেহটি বসিয়ে চাদর অথবা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। মৃতদেহের ঠিক পাশেই জ্বালিয়ে রাখা হয় পাঁচটি প্রদীপ। তারপর পুরোহিত পোবো লামাকে ডাকা হয়। পোবো লামা একাই ঘরে ঢোকে এবং ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ করে দেয়। এরপর পোবো মন্ত্র পড়ে শরীর থেকে আত্মাকে বের করার চেষ্টা করে। প্রথমে মৃতদেহের মাথা থেকে তিন-চার গোছা চুল টেনে ওপরে আনে। তারপর পাথরের ছুরি দিয়ে মৃতদেহের কপালের খানিকটা কেটে প্রেতাত্মা বের করার রাস্তা করে দেওয়া হয়। শবদেহকে নিয়ে রাখে একটা বড় পাথরের টুকরোর ওপর। ঘাতক একটি মন্ত্র পড়তে পড়তে মৃতদেহের শরীরে বেশ কয়েকটি দাগ কাটে। দাগ কাটার পর একটি ধারালো অস্ত্র দিয়ে সেই দাগ ধরে ধরে মৃতদেহকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হয়। তারপর পশুপাখি দিয়ে খাওয়ানো হয়।

তিব্বতের সামাজিক অবস্থার কথা বলতে গেলে বলতে হয় এমন এক সমাজের কথা, যা গড়ে উঠেছিল আজ থেকে প্রায় ছ'হাজার বছর আগে। তখন পীত নদীর উপত্যকায় চিনারা জোয়ার ফলাতে শুরু করে। অন্যদিকে আরেকটি দল থেকে যায় যাযাবর। তাদের মধ্য থেকেই তিব্বতি ও বর্মি সমাজের সূচনা হয়।

খাবারদাবারেও রয়েছে যথেষ্ট ভিন্নতা। শুনলে অবাক হবেন উকুন তিব্বতিদের অতি প্রিয় খাবার। ঐতিহ্যগত তিব্বতি সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ যাযাবর বা রাখাল জীবনযাপন। ভেড়া, ছাগল ও ঘোড়া পালন তাদের প্রধান জীবিকা। শুধু চিনের তিব্বত স্বশাসিত অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার ২৪ শতাংশ এই যাযাবর রাখাল সম্প্রদায়। এরা কখনও চাষাবাদের কাজ করে না। মোট ভূমির ৬৯ শতাংশ এলাকা চারণ বা তৃণভূমি। চিনা ঐতিহ্যের সঙ্গে মিল রেখে তিব্বতিরাও ভীষণ চা প্রিয়। তাদের বিশেষ চায়ে মেশানো হয় মাখন এবং লবণ। তবে তিব্বতিদের প্রধান খাবার হল চমবা। গম এবং যবকে ভেজে পিষে চমবা তৈরি করা হয়। তারা খাবার পাত্র হিসাবে ব্যবহার করে কাঠের পেয়ালাকে। আধুনিক বিশ্ব দিন দিন আধুনিক হলেও আজও তিব্বত বিশ্বে রহস্যময় একটি অঞ্চল।

সালমা আহমেদ